ধ্রুবতারা

Central Texas Bengali Association, Austin, Texas

October 2023 | বঙ্গাব্দ ১৪৩০

PRIME FAMILY CARE

LITTY VADAKKAN APRN, FNP-C

- ACCEPTING NEW PATIENTS
- ANNUAL PHYSICAL / BLOOD WORK / PAP SMEAR
- SAME DAY SICK VISITS
- FLU/ STREP/ COVID TESTING & TREATMENT
- SELF-PAY FOR UNINSURED
- ALL MAJOR INSURANCES ACCEPTED

YOUR ONE-STOP CLINIC FOR PRIMARY CARE!

aetna · Medicare · Humana · United Healthcare · Cigna · BlueCross BlueShield

512-400-4025

1000 GATTIS SCHOOL RD SUITE 440 ROUNDROCK TX 78664

Email - care@primefamilycare.com | Web - www.primefamilycare.com

সুচিপত্র

Cover picture – Maa Durga	Nayanika Dasgupta	1
Executive Committee		5
সম্পাদকীয়	Magazine Committee	7
President's Corner	Jayeeta Dasmunshi	9
In Loving memory – Mousumi Karmakar		11
CTBA Activities 2023	Ritwik Sen	12
মাতলা নদীর মোহনা	অমিয় বাসু	13
বিস্মৃতি	দেবস্মিতা পাল চ্যাটার্জি	19
একটি ডাকাতির গল্প	কেকা বসুদেব	26
ঝরার বেলায়	প্রবাল দাশগুপ্ত	29
মহর্ষী	পাপিয়া দাসগুপ্ত	29
বেগুনের বেগম বাহারী	শ্রেয়সী দত্ত ভট্টাচার্য্য	31
শেষ চেষ্টা	মৈত্রেয়ী চক্রবর্তী	32
সুখ নেইকো মনে	লক্ষী বন্দ্যোপাধ্যায়	37
কিছু মিষ্টি কথা	মালবিকা বাসু	39
আরাধনা	বিমল সরকার	43
বৈশাখী	মানস দে	44
স্মৃতির হাত ধরে কিছুদূর	মনীষা সরকার	47
সায়াহ্নে	পাপিয়া দাসগুপ্ত	50
Jumping Girl	Aarushi Das	51
Lost in tranquility	Sreeja Dutta	51
যক্ষ যুধিষ্ঠির কথোপকথন	পার্থ মুখার্জী	52
Dhaaker Taal	Rumku Chowdhury	56
কালশিটে কাত্তিক	প্রদীপ্ত দে	57
মিনি	শুভা আঢ্য	60
Mt Everest	Aharshi Das	68
আলু পোস্ত	সুদীপ সরকার	69
Maa Durga	Mithu Deb	73
বৃক্ষরোপণ	সুস্মিতা সেন	74

আমার দেখা Loumarin	নন্দিতা সরকার	81
ঐ দাগ – টাই	অরুণজিৎ দত্ত	84
মেঘ–বৃষ্টি, রাগ মালহার আর প্রেমের দিব্যির মান্ডু	সুতপা ভৌমিক	85
Comics – ভাসান	Ayan Guha	89
কবি হওয়া	শুভ্র চ্যাটার্জি	93
জয়সলমীর	রুপা মুখার্জী	94
পাহাড়দের গল্প	সহেলি বন্দ্যোপাধ্যায়	95
Lord Jagannath Balaram and Subhadra	Prajakta Bhattacharjee	96
Arandhuni	Debasree Dasgupta	97
Oh, for Love's Sake!	Hrisiraj Sengupta	101
Devi Durga	Myra Mukherjee	104
Weakie and the King of the Land	Mia Prabhu, Dev Prabhu	105
Tagore Grove Memorial	Mrinal Chaudhuri	107
MY HOLY TRINITY	Sayani Bose	111
Understanding a bit of Black History	Shantanu Ganguly	117
Pondering from a Perilous Perch	Sumit DasGupta	123
Travelogue of an Epic trip to Greece!	Pradipto Mukherjee	128
Terra Cotta Warriors of Xian, China	Sunit K. Addy	134
Recent Graduates		142
Looking Out	Ratula Sarkar	143

CTBA Lakshmi Puja 2023

Sunday, Oct 29, 5:00 PM – 9:00 PM

DISCLAIMER

The views, thoughts and opinions expressed in this magazine belong solely to the authors and do NOT reflect the views or the official position of the Central Texas Bengali Association.

Executive Committee (Singhi Bahini 2023)

Central Texas Bengali Association | www. ctbaaustin.org

Jayeeta Dasmunshi
President

Piyali Dey
Vice President

Shibani Gupta
General Secretary

Debolina Bose
Treasurer

Suparna Sinha Roy
Technology

Pujo Committee

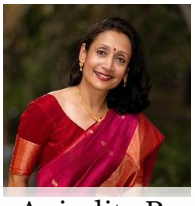

Anindita Roy Bardhan

Rupa Mukherjee

Samira Ghosh

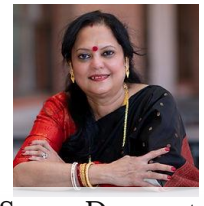

Suma Dasgupta

Magazine Committee

Shubha Addy

Sunit Addy

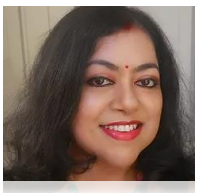

Debasmita Paul Chatterjee

Ritwik Sen

Cultural Committee

Basundhara Roy Chowdhury

Jayashree Kar

Suranjima Kar

Tania Mukherjee

Food Committee

Aparna Ghosh

Bonnhi Chowdhury

Krishnakali Sarkar Guha

Rupa Sengupta

Development & Innovation

Rakhi Das

Ruma Goswami Talukder

Upasana Das Sarma

Operational Excellence

Jyoti Anirban Das

Monisha Giri

Damitra Sarkar

DISCLAIMER

The views, thoughts and opinions expressed in this magazine belong solely to the authors and do NOT reflect the views or the official position of the Central Texas Bengali Association.

সম্পাদকীয়

শারদীয়া দুর্গোৎসব। সাত সাগরের পারের, এই দূর বিদেশের বাসিন্দা, প্রতিটি বাঙালির কাছে এক অনন্য অভিজ্ঞতা। আমাদের এই পূজা প্রাঙ্গনে আসেন মাতৃরূপা জগৎ জননী, ও সেই সঙ্গে আমরা নিবিড় করে অনুভব করি আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, যা পুরুষানুক্রমে আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছে তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। এই দূর প্রবাসে বসেও, কোন এক মন্ত্রবলে শুনতে পাই এক আনন্দময়ীর শুভ আগমনী বার্তা। আমাদের সমস্ত কাজ- অকাজের ব্যস্ততাকে ছাড়িয়ে, মনের মধ্যে বেজে ওঠে ঢাকের বাজনা, আর মন কেমন করে ওঠে সেই অনেক দূরে ফেলে আসা শিশির ভেজা শিউলির গন্ধ মাখা, আলোয় আলোকময় দিনগুলোর জন্য। শুনতে পাই,-- "মা আসছেন, ওঠো, জাগো, প্রস্তুতি করো মায়ের আসন্ন আগমনীর।"

আমাদের টেক্সাসে এবার বিধাতার রুদ্র রোষে গ্রীষ্মের দাবদাহটা কিছু বেশি মাত্রায় হয়েছিল। বসন্তের পর বর্ষা আর মঞ্চে প্রবেশ করার সুযোগই পেলোনা, বৈশাখের প্রারম্ভেই দারুন অগ্নিবানের বিভীষিকায় সমস্ত মানুষ অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। এই শুষ্কতাপের দৈত্যপুরে যে যেন কোন এক মন্ত্রবলে, অকস্মাৎই ,আশ্বিনের দিনগুলো এসে আমাদের অবাক করে দিয়েছে । নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা, ভোরের মিষ্টি বাতাস, শরত আলোর কমল বনের সৌরভ অঞ্চল ভরে এনে দিয়েছে ডাক,--পুজো আসছে ! পুজো আসছে !

আমাদের এই পৃথিবী আজ নানা সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। যুদ্ধ, হিংসা, প্রকৃতির ধ্বংসলীলা, তাকে এক মৃত্যুময়ী ভবিষৎএর দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। চারি দিকে অশান্তির হাওয়া উঠেছে উত্তাল হয়ে। তাই বুঝি আমরা পরম আগ্রহে দুর্গতি নাশিনী দুর্গার আবির্ভাবের আশ্বাস নিয়ে অপেক্ষা করে আছি? আশা করে আছি মহামায়ার আগমনে, তাঁর পবিত্র পরশে ঘুচে যাবে কলুষ অন্ধকারের কালিমা, অসত্যের বিষাক্ত প্রসার, রোগ, শোক, দুঃখ হবে প্রশমিত।

আজ এই দূর প্রবাসে আমরা মা কে আমাদের সাধ্যমতো শ্রদ্ধা ভক্তি ও উপাচারে করবো পূজা। সবার মিলনে পূজা প্রাঙ্গন হয়ে উঠবে আনন্দের সম্মিলন। এই মাতৃ রূপের কাছে আমাদের সবার প্রার্থনা,---"এস মা, তোমার পুন্য পরশে আমাদের এই পৃথিবীতে, আর আমাদের জীবনে, আসুক শান্তি, আসুক তৃপ্তি, আসুক নিরাময়।"।

পূজা উপলক্ষে সাহিত্যের বর্ণালীকে সবার কাছে তুলে ধরা অস্টিন এর এক ঐতিহ্য। গত বহু বছর ধরে এই রীতিটির অন্যথা হয়নি। প্রথম পত্রিকাটিকে প্রস্তুত করেছিল আমাদের প্রিয় বন্ধু সংঘমিত্রা (মিঠু) দেব। সে দিনের সেই ছোট্ট পত্রিকাটি আজ অন্যরূপ ধারণ করলেও সে তার শুরুর কথাটি বিস্মৃত হয়নি । আমাদের পত্রিকাটি এবার আমরা সকলে সাজিয়ে এনেছি আপনাদের জন্য। আপনাদের ভালো লাগাতেই আমাদের পরিতৃপ্তি।

আপনাদের জেনে ভালো লাগবে, আপনাদের মনোরঞ্জনের জন্য, আমাদের পত্রিকা কমিটি, এই বার্ষিক পত্রিকার সঙ্গে সঙ্গে একটি মাসিক News Letter,--"খোঁজ খবর" ও Digital Platformএ একটি ত্রৈমাসিক Talk Show,--"গল্প হোক" প্রস্তুত করছে।যে সব বন্ধুরা আমাদের নিজেদের লেখা, ছবি,ও Photograph দিয়ে পত্রিকাটিকে সাজাতে সাহায্য করেছেন তাঁদের অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

সকলকে আমাদের আন্তরিক শারদ শুভেচ্ছা জানিয়ে "ধ্রুবতারা" আপনাদের হাতে তুলে দিলাম। - **শুভা আঢ্য | সুনীত আঢ্য**

"গল্প হোক": বাঙ্গালী প্রজাতি, দুর্গা পূজা আসক্ত, রবীন্দ্র ভক্ত, মাছ ও মিষ্টি প্রিয় এবং সততই আড্ডাবাজ প্রজাতি। সুতরাং প্রকৃত বাঙ্গালিয়ানা বজায় রাখতে অস্টিনের বঙ্গবাসী এতদিন যাবৎ তার প্রকৃষ্ঠ উদাহরণ রেখে চলেছে। তারা প্রতি বছর হৈহৈ করে দুর্গা পুজো করে। শ্রদ্ধার সঙ্গে রবীন্দ্রজয়ন্তী করে। পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে নিজগৃহে দক্ষতার সঙ্গে রসগোল্লা বানাতে শিখে নিয়েছে, বিদেশি মাছ দিয়ে মা ঠাকুমার দেশি রান্নাও পেছনে পড়ে নেই। বাকি রইল আড্ডা, তা সেটিও সপ্তাহান্তে বাড়ি বাড়ি হয় বৈকি। কিন্তু তাতে এই e book আর YouTube এর যুগের প্রযুক্তির শিলমোহর না থাকলে আধুনিকতা বজায় রাখা মস্ত কঠিন হয়ে পড়েছে।

তাই আমরা, অর্থাৎ CTBA-র, পত্রিকা 'ধ্রুবতারা' গোষ্ঠী, দায়িত্ব সহকারে আমাদের বাৎসরিক পত্রিকার সঙ্গে সংযোজন করলাম "গল্প হোক" talk-show-এর। আশা করছি এর মধ্যে নিশ্চই অনেকেই পরিচিত হয়েছেন আমাদের এই নতুন প্রয়াসটির সাথে। গল্প হোক অনুষ্ঠানটি CTBA Austin-র YouTube channel এ পরিবেশিত হয়। 2023-এ এযাবৎ এই ত্রৈমাসিক অনুষ্ঠানটির তিনটি কিস্তি মুক্তি পেয়েছে।

১) প্রথম প্রজন্মের অভিবাসি হিসাবে ভিন্ন দেশে বা পরিবেশে অভিভাবকত্ব।

২) Sandwich Generation

৩) শারদীয়ার আড্ডা

আমাদের উদ্দেশ্য, বিদেশের মাটিতে, নিজেদের মত করে নিত্য নৈমিত্তিক ছোটো বড়ো সমস্যার বা রোজনামচায় হোঁচট খাওয়া প্রশ্ন গুলোর সমাধান খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা। আমরা তার জন্য ডেকে নিই আমাদেরই মধ্যে থেকে কিছু পরিচিত, অভিজ্ঞ মানুষদের সেই বারের নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য, একেবারেই আড্ডা গল্পের আদলে চলে আমাদের তথ্য বিনিময়। আলোচনার শেষে একটু মজা করতেও আমরা কক্ষনো ভুলি না। সাদর আমন্ত্রন রইল আমাদের আড্ডার আসর "গল্প হোক"-এ, আশা রাখি ভাল লাগবে। আসুন গল্প হোক। - **দেবস্মিতা পাল চ্যাটার্জি**

"**খোঁজ-খবর":** On December'22 CTBA launched it's very first monthly newsletter, "Khonj-Khobor" (খোঁজ-খবর). The idea was to build a platform that brought the community together through sharing of news, ideas, creative work and of course friendly banter. Over the course of the past 10 months we've shared an ongoing series around CTBA history, covered relevant news and events, shared creative works of our members as well as highlighted impactful activities CTBA had engaged in. The newsletter reaches 800+ Austinites every month and have been made possible by the contributions of the community members, the generosity of our sponsors and the untiring efforts of the magazine committee. But we're asking for more help – we need you to tell us what you'd like us to cover ? What elements would make you look forward to the next issue ? We're also looking for you to engage more – not just as a reader, but also as a contributor. This is our newsletter. Let's own this together – **Ritwik Sen**

DISCLAIMER

The views, thoughts and opinions expressed in this magazine belong solely to the authors and do NOT reflect the views or the official position of the Central Texas Bengali Association.

President's Corner

Jayeeta Dasmunshi
Austin, TX, 2023

As the sweltering days of Central Texas summer gracefully yield to the enchantment of autumn, a spectacular transformation unfolds before us. The mood, once resplendent with vibrant blooms and sun-kissed brilliance, now dons a cool breeze from the north, a harbinger of rich tapestry permeated with crimsons, oranges, and golds, as if nature herself is donning her most opulent attire for Maa Durga. The air carries a hint of subtle crispness, heralding the arrival of cooler days, and the ether that pervades us appears to exhale a collective sigh, embracing the profound beauty and inevitable change that is so gracefully bestowed upon us. To us Bengalis, this change beckons the arrival of goddess Durga, resplendent atop her majestic lion, symbolizing the embodiment of divine feminine power, and her arrival signals the triumph of good over evil. Amidst the fragrant incense and the joyous cries of "Durga Maa ki Jai," families gather to celebrate with elaborate rituals, cultural performances, and a profound sense of unity and devotion. Maa Durga's homecoming is a time for us to unite to revel in spirituality, tradition, and the enduring strength of faith.

Upon thoughtful contemplation of the preceding year, I am both gratified and humbled by the significant strides we have made this year towards advancing CTBA's mission. With relentless support from the community in 2023 we bolstered CTBA's community outreach with milestones events such as saree drive for AFSSA (Asian Family Support Services of Austin), Christmas donation drive for Goodwill, children's book drive, and summer camp for children to enumerate a few. Another truly remarkable achievement this year was the proclamation, made by Vikki Goodwin, a Texas House of Representative, designating May 13th as Rabindra Nazrul Jayanti Day. This noteworthy event garnered attention and recognition, even receiving coverage in Ananda Bazaar Patrika of Kolkata and KEYE CBS News Austin. 2023 also marks the year in which CTBA introduced 'Golpo Hok' an interactive talk show that presents a distinctive digital platform for us to share our diverse experiences and unique perspectives.

As the president, I am profoundly indebted to our dedicated CTBA executive committee team for the incredible success we have achieved. Their unwavering commitment, tireless efforts, and exceptional talents have been the singular driving force behind our accomplishments. Kobi guru Rabindranath Tagore's profound wisdom, "You can't cross the sea merely by standing and staring at the water; teamwork and perseverance are the oars that propel us towards success," eloquently

reflects my deep appreciation for the exceptional team I have been fortunate to work alongside. On a similar perspective, any words of appreciation for our CTBA community members, sponsors, and donors inevitably feels inadequate to convey the profound gratitude we hold for their steadfast support and indefatigable dedication to CTBA's mission. Your contributions are the very bedrock of our existence and have been invaluable in helping us make a meaningful impact on our community, and we are deeply appreciative of the devotion to our cause.

As we approach the end of another remarkable year at CTBA, I am filled with immense gratitude for your unfaltering wholehearted commitment to our mission and for being graced with the privilege to serve as the president. Together, we have achieved extraordinary milestones, touched countless lives, made a positive impact on our community, and have taken great strides in furthering the mission of CTBA. As we reflect on the challenges and triumph of the past year, let us also look forward to the opportunities and potential that the future holds for us. With Maa-Durga's blessings bequeathed upon us and your continued support and dedication, we are poised to accomplish even greater things in the coming years.

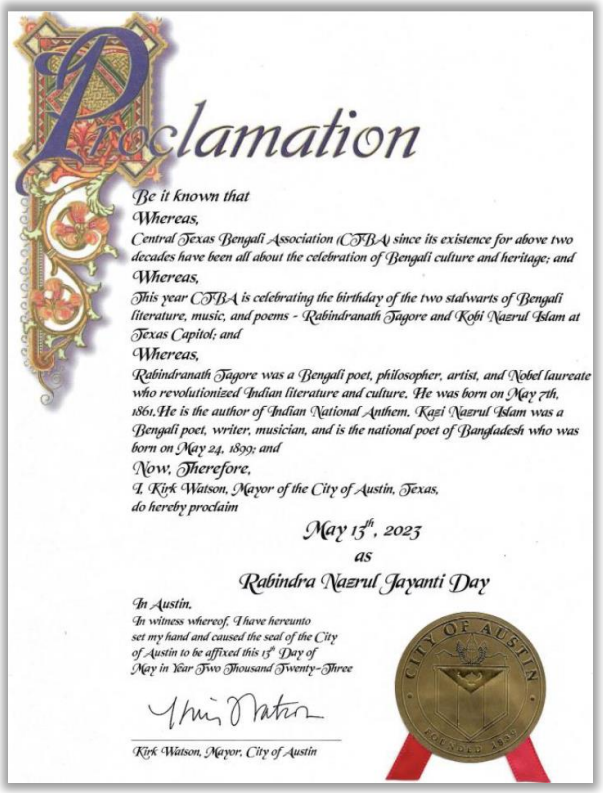

Proclamation

Be it known that

Whereas,
Central Texas Bengali Association (CTBA) since its existence for above two decades have been all about the celebration of Bengali culture and heritage; and

Whereas,
This year CTBA is celebrating the birthday of the two stalwarts of Bengali literature, music, and poems - Rabindranath Tagore and Kobi Nazrul Islam at Texas Capitol; and

Whereas,
Rabindranath Tagore was a Bengali poet, philosopher, artist, and Nobel laureate who revolutionized Indian literature and culture. He was born on May 7th, 1861.He is the author of Indian National Anthem. Kazi Nazrul Islam was a Bengali poet, writer, musician, and is the national poet of Bangladesh who was born on May 24, 1899; and

Now, Therefore,
I, Kirk Watson, Mayor of the City of Austin, Texas,
do hereby proclaim

May 15th, 2023
as
Rabindra Nazrul Jayanti Day

In Austin,
In witness whereof, I have hereunto
set my hand and caused the seal of the City
of Austin to be affixed this 15th Day of
May in Year Two Thousand Twenty-Three

Kirk Watson, Mayor, City of Austin

CITY OF AUSTIN FOUNDED 1839

With deepest appreciation,

Jayeeta Dasmunshi
President 2023 Executive Committee
Central Texas Bengali Association

DISCLAIMER
The views, thoughts and opinions expressed in this magazine belong solely to the authors and do NOT reflect the views or the official position of the Central Texas Bengali Association.

In Loving Memory

Mousumi Karmakar

December 14, 1970 – August 31, 2023

Mousumi was a kind, compassionate and generous soul. She loved the simple things in life, especially spending time with her precious family.

The Karmakar family is sincerely grateful to many friends who have given us support and comfort during this time of great loss.

CTBA Activities 2023

Pictures say a thousand works – Here's a highlight of the CTBA community activities through pictures

Saree Drive

Kobi Pronaam @ Capitol

Saraswati Puja

Winter clothes collection drive

Anondo Utsav

Annual Picnic

Book donation drive

Initiatives

Food Drive

Mahalaya Concert

Summer Camp

Durga Puja Concert

মাতলা নদীর মোহনা

অমিয় বাসু

আকাশ তখনও গাঢ় নীল। অর্জুনের প্লেন কোলকাতা পৌঁছতে আরো তিন ঘন্টা। অর্জুন – ডক্টর অর্জুন ওয়েবার – আঠাশে পা দিল। ঘুমের ঘোরে কত কি মনের আনাচে কানাচে ঘুরছে। দাদু দিদা, সুরিন্দর আর কিরণ এর হাত ধরে ঝড়খালি থেকে কোলকাতায় আসা। কলকাতাতেই পড়াশুনো করা বড়ো হয়ে ওঠা। আর অর্জুনের পদবি ওয়েবারই বা কেন ?

সেসব ১৯৪০ দশকের কথা। কোলকাতার রাস্তায় তখন ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ, ডাচ, আমেরিকান সোলজারদের উপস্থিতি । ২০–২২ বছরের Kansas farm boy, স্কট ওয়েবার–এর রয়াল বেঙ্গল টাইগার – in the wild - দেখার ঝোঁক। কলেজ স্ট্রিটের এক বই এর দোকানে গিয়ে বই এর দোকানদার কে জিজ্ঞেস করল ,

"Do you have a book on the Royal Bengal Tiger ?"

দোকানদার চার পাঁচটা বই দিয়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরিজিতে বললো, “সত্যিই যদি বাঘ দেখতে চান, ঝড়খালি চলে যান।“

“How?” স্কটের প্রশ্ন। “এই নিন ঠিকানা।“

R&R (Rest & Relaxation) এর সময় পেতেই স্কট শেয়ালদহ স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠে সোজা ক্যানিং। সেখান থেকে ছোট নৌকোয় মাতলা নদী দিয়ে বাসন্তি, সোনাখালী হয়ে ঝড়খালি। সুরিন্দর–কিরণের স্কুল বা আশ্রম খুঁজে পেতে বিশেষ অসুবিধে হলো না।

তবে স্কটেরই সমবয়সী সুরিন্দর–কিরণের মেয়ে সোনিয়া ছাড়া কেউ ছিল না। আর কেউ বলতে ওদের ছেলে রাজপাল। রাজপাল তখন গ্রামের তৈরি হস্তশিল্প দেশে বিদেশে প্রচারের কাজে ব্যাস্ত।

স্কটের নৌকো ঝড়খালি পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে গেল। জলে কুমির ছাড়াও, দূরে জঙ্গলে কয়েকটা চিতল হরিণ দেখা গেলো। চোখের আড়ালে হয়ত বাঘও ছিল। আওয়াজ শুনে সোনিয়া বাইরে এসে স্কটকে দেখলো।

Hello, I'm Scott. বলে স্কট ওর হাত এগিয়ে দিলো।

সোনিয়া মনে মনে বলল, নিশ্চয়ই ব্রিটিশ স্পাই। কিছুটা ভয়–মেশানো বিরক্ত নিয়েই বলল, “This’s Sonia, how can I help?”

“I want to see a Royal Bengal tiger.” সোনিয়া রাগতে গিয়েও হেসে ফেলল।

“Sounds like you're kind of serious.”

“Of course, I am! Is there a place to stay here somewhere?”

“No, there isn’t. You're in the middle of the Sundarbans. It's quite dangerous here after dark.”

সোনিয়া জানেনা স্কট কতটুকু জানে বা বোঝে। ওর বাবা, মা সুরিন্দর, কিরণ স্বাধীনতা সংগ্রামী। এখানে গ্রাম উন্নয়নের কাজই ওদের ব্রত।

“My parents will be back this evening. If you can wait that long, they may suggest something.”

আর্থিক সাহায্য ছাড়া অবৈতনিক স্কুল চলবে কিভাবে? সেই কারণেই সুরিন্দরদের কোলকাতা যেতে হয়ে ছিল ।

সুরিন্দর আর কিরণ ফিরতেই স্কট নিজেই এগিয়ে গিয়ে পরিচয় দিল।

“So you're back.” বাকিটা সোনিয়াই জানাল।

স্কটের হাবভাব চালচলন দেখে ওদের মনে হলো স্কটের মধ্যে একটা গ্রাম্য সরলতা আছে। তার পরের দিন স্কট স্কুলের ছাত্র, ছাত্রী পড়ানো, বাড়ি, ঘর, রাস্তা সবই দেখলো। ওর rural Kansas এর one room school এর কথা মনে পড়ছিলো বার বার ।

R&R থেকে AWOL (Absent Without Leave), শেষে honorable Discharge নিয়ে স্কট ঝড়খালিতেই রয়ে গেল। গরু বলদের জায়গায় ট্র্যাক্টর দিয়ে চাষ করা স্কটই শেখাতে শুরু করলো।

ভারতবর্ষ ততদিনে স্বাধীন দেশ । সুরিন্দর, কিরণের ছোট স্কুল আজ এক ছোটোখাটো ক্যাম্পাস । তার সঙ্গে ক্লিনিক। নতুন সরকার সাহায্যের কথাও জানিয়েছে।

সোনিয়ার প্রথমে আপত্তি থাকলেও, স্কটের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে, সোনিয়া এখন মিসেস ওয়েবার।

এরই মাঝে স্কট সোনিয়ার প্রথম সন্তানও এসে গেছে। স্কট নাম রাখল টাইগার। দাদু দিদার পছন্দসই নাম অর্জুন।

ঝড়খালি নামটা যথার্থই। কয়েক বছর অন্তর অন্তরই ঘূর্ণি ঝড়ের প্রকোপ। তবে সে বছর পর পর দুবার বড় রকমের ঘূর্ণিঝড় এল। প্রতিবেশীদের বাঁচাতে গিয়ে স্কট সোনিয়া এগিয়ে গেল। ওই ঝড় বৃষ্টির রাতের অন্ধকারে স্কট আর সোনিয়া যে কোথায় হারিয়ে গেলো, কেউ তার খবর দিতে পারল না।

বাবা-মা হারা অর্জুন দাদু দিদার কোলে পিঠে বড়ো হতে লাগলো ।

ল্যান্ডিং গিয়ার্ নাবার আওয়াজে অর্জুনের ঘুম ভেঙে গেল। লাগেজ নিয়ে বেরোতে বেরোতে প্রায় রাত ১১টা ।
"কিরে দাদা তুই তো পুরোপুরি সাহেব হয়ে গেছিস,!" এত ভীষণ চেনা গলা!
"ঝিলিক?"
"তুই কি ভাবলি?"
"আমি তো সেই স্কুলে পড়া ঝিলিক দেখে গেছি।"
"আমার ফাইনাল ইয়ার-"
"দাদু দিদা আসেনি ?"
"ঐতো।"
"মামা মাইমা ভালো আছে তো ?"
"এত কথা টার্মিনাল বিল্ডিঙের সামনে বলা যায় ? গাড়িতে ওঠে বলবো ।"
"দাদু দিদা তোমরা আবার এত রাত্তিরে কষ্ট করে এলে কেন ?"
"তোর যখন নাতি হবে তুই তখন বুঝবি কেন।"

মামার বাড়ির সামনে অত গাড়ি লোকজন দেখে অর্জুনের আগ্রহ বাড়তেই লাগল । দরজার সামনেই মামীমা, মৃন্ময়ী, দাঁড়িয়ে ছিলো।
"আয় অর্জুন। তুই'ত gentleman হয়ে গেছিস। ঝিলিক দাদাকে নিয়ে ওপরে তোর ঘরে যা। আমি আসছি।"
দাদু দিদাও খুব একটা কিছু বলছে না। মামীমা ওপরে ঝিলিকের ঘরে এসে অর্জুনের পাশে বসলো।
"তোর মামার গুরুদেব 'মৌনীবাবা' এবাড়িতে এসে আছেন।" অর্জুনের কথাটা মাথায় ঠিক ঢুকলো না।

"এসে আছেন মানে ?" মামীমা কিছুটা চুপ করে থেকে বললো,
"গত তিন ধরে..."
"মামা কবে দীক্ষা নিলো ?"
"গত বছর।"
"গুরুদেব কিভাবে communicate করেন ?"
"স্লেটে লিখে।" মৃন্ময়ী আরো জানালো,
"মুশকিলটা অন্য জায়গায়। গুরুদেব হিন্দিতে লেখেন।"
"তুমি হিন্দি জানো ?"
"জানি, তবে ওনার লেখা পড়তে অসুবিধে হয় খুবই।"

"তাহলে?"
"ঝিলিক ছাড়া আর কেউই ভালো পড়তে পারে না।" অর্জুন কি বলবে বা কি বলা উচিত কিছুই বুঝতে পারলো না।

"তার ওপর আজ চিফ মিনিস্টার আসছে।"
"সেকি ? কেন ?"
"আমরা জানিনা। কিন্তু কি করে না বলি ?"
"এতো রাত্তিরে...আর কখন আসবে ?"

"আগেই আসার কথা। তাইতো আমি এয়ারপোর্টে আসতে পারিনি।" মৃন্ময়ীর কথা শেষ হবার আগেই, চিফ মিনিস্টারের পাইলট কার এর আওয়াজ পাওয়া গেলো।

চিফ মিনিস্টারের সঙ্গে মৌনীবাবার সঙ্গে মিটিংয়ে, ঝিলিককেও ডাকা হয়নি। চিফ মিনিস্টার চলে যাওয়ার পর, অর্জুনের সঙ্গে রাজপালের (মামা-ভাগনের) কথা হলো।
"তুই দেশে ফিরে কি করবি কিছু ভেবেছিস ?"
"যা পড়েছি তাই নিয়েই কাজ কোরবো।"
"High tech farming ...."

অর্জুন হেসে ফেলে বললো, "না, না advanced agricultural economics বলতে পারো।"
"তাই নাকি? মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যখন মিটিং হবে, তোর প্ল্যান জানাস ।"
"তুমি তো জানোই আমি রাজনীতি থেকে অনেক দূরে থাকতে চাই।"
"কিন্তু তোকে যে কালকে চিফ মিনিস্টারের সঙ্গের মিট করতে হবে।"
"আমাকে জিজ্ঞেস না করে তোমার মিটিং সেট আপ করা ঠিক হয়নি।" মামা বুঝল, ভাগ্নে বড়ো হয়ে গেছে।
"আমার ঝড়খালি যাওয়া খুবই দরকার মামা।"
"নিশ্চয়ই যাবি। কবে যেতে চাস?"
"যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।"
"ভালোই হল। তুই গুরুদেবের সঙ্গে চলে যা।"
"গুরুদেব অত দূর..."
"গুরুদেব মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টারে যাবে। দাদু দিদার গ্রাম উন্নয়নের কাজ গুরুদেব নিজে দেখতে চান। "
"সঙ্গে কে যাবে ?"
"দাদু দিদা আর ঝিলিক। "
"কাল সকালে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করিস।"
"আচ্ছা। তোমার কাজ কেমন চলছে ?"
"ওই ব্যাপারে তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে।"
"আমার সঙ্গে...?"
"Middlemen দের বাদ দিয়ে চাষীদের ফসল বাজারে পৌঁছন সোজা কথা নয়।"
অর্জুন মনে মনে হাসল। Agricultural marketing highly specialized area এটাইতো ওর area of research.

"ঠিক আছে। কাল তোমার সঙ্গে কথা বলবো।"

অর্জুন একাই মৌনীবাবার সঙ্গে দেখা করল। কাজ চালানো হিন্দি ওর জানা ছিল।

"ক্যাইসে হো, অর্জুন?" স্লেটে লেখার দিকে অর্জুন চেয়ে রইলো।

আস্তে আস্তে অর্জুন নিজের চিন্তাধারা, পড়াশুনো, বাবা মা ছাড়া বড় হওয়ার কথা সবই বলতে শুরু করলো। মৌনীবাবা সব শোনার পরে লিখলেন, "তুম ঝড়খালি চলোগে মেরা সাথ?" এটা যে প্রশ্ন নয় অর্জুনের বুঝতে অসুবিধে হলো না।

আলিপুর রেসকোর্স হেলিপ্যাড থেকে ঝড়খালি এক ঘন্টাও লাগে না। দিনটাও ঝকঝকে। শহর থেকে শহরতলি অবশেষে গ্রামাঞ্চল। সুন্দরবন যে কেন সুন্দর ওপর আকাশ থেকে বোধহয় আরো ভালো বোঝা যায়।

অর্জুন মাতলা নদীর মোহনা আর বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে মিশে যাওয়ার এই দৃশ্য কখনো দেখেনি। ওর বাবা স্কট ওয়েবারের যে কেন সুন্দরবন ভালো লেগেছিল অর্জুন কিছুটা বুঝলো।

খোলা হাওয়া সবুজ বন গাছ পালা সব মিলিয়ে শুধু অর্জুন, ঝিলিকেরই নয়, মনে হল মৌনীবাবারও ঝড়খালি ভালো লেগেছে। লিখে জানালেন যদি দাদু দিদার আশ্রমে কয়েক দিন থাকতে পারেন।

হেলিকপ্টার পাইলট অর্জুনকে আগেই জানিয়েছিলো বিকেলে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস আছে। ঝড়ের প্রথম প্রকোপ সুন্দরবনের দ্বীপগুলোতে এসে পড়ে। ঝড়খালি তার মধ্যে প্রথম সারিতে ।

গুরুদেব অর্জুনকে লিখলেন , "আজহি ওয়াপস যাওগে ?" ঝিলিকও বলার চেষ্টা করল, "দাদা তোকে আজই যেতে হবে ?"

পাইলট আবার জানিয়ে গেল, “তিনটের মধ্যেই বেরোতে হবে।“

বেরোতে কিছুটা দেরিও হলো। দূরে কালো মেঘের ডাক শোনা যাচ্ছে । হেলিপ্কপ্টার আকাশে কয়েকশো ফিট ওঠার পরেই হটাৎ দমকা ঝোড়ো হাওয়া তার পরেই ঘূর্ণিঝড় শুরু হলো। অর্জুন শেষ বারের মতো রুপোলি সুতোর মতো মাতলা নদী আর প্রায় অদৃশ্য হয়ে যাওয়া ঝাড়খালী দেখার চেষ্টা করলো।

কপ্টারটা ওলটপালট খেতে খেতে মাতলা নদী পেরিয়ে বঙ্গোপসাগরের গিয়ে আছড়ে পড়লো। ওর বাবা-মার মতোই অর্জুনও মাতলা নদীর মোহনায় চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেল।

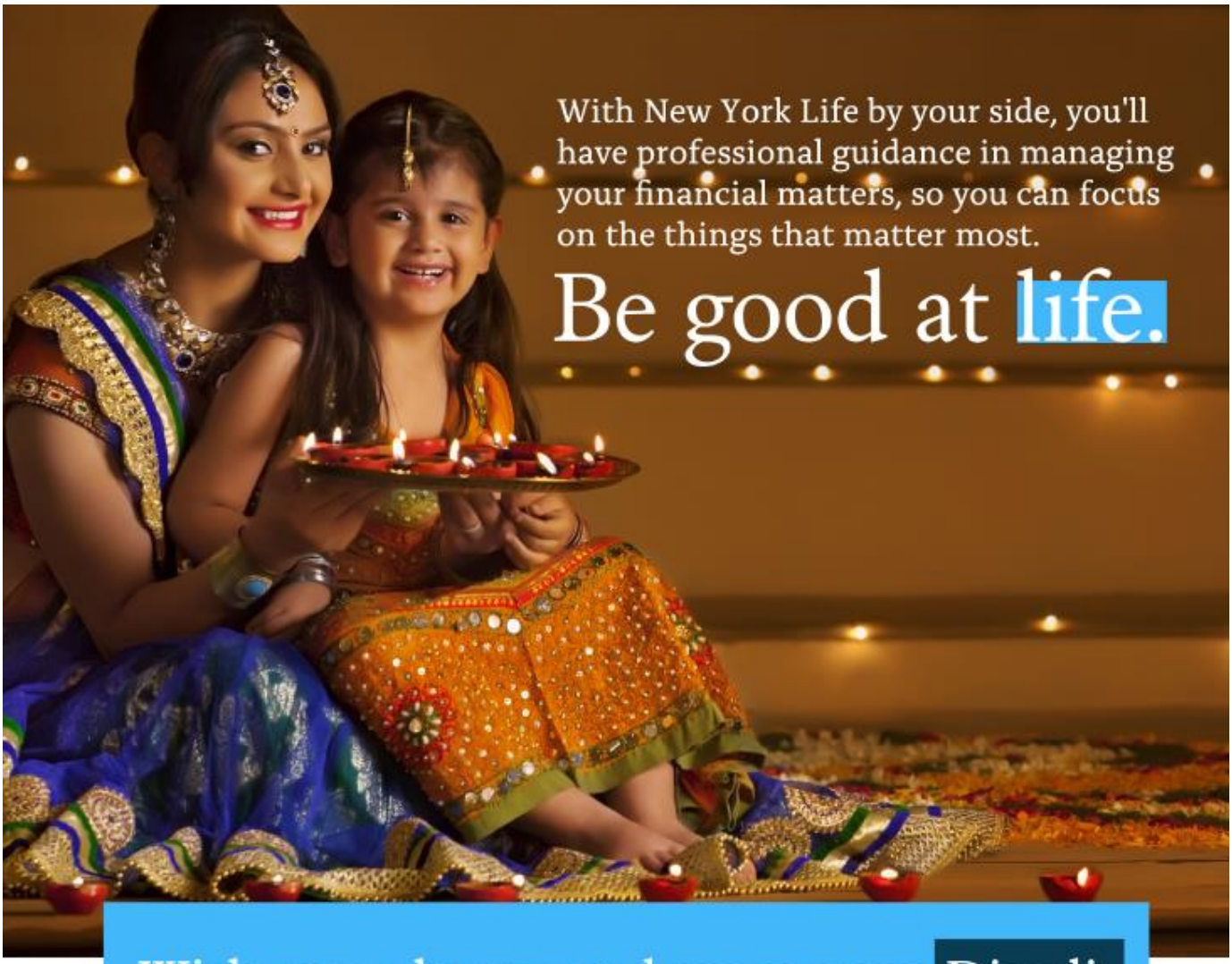

Wish you a happy and prosperous Diwali.

A Time To Celebrate Life. A Time To Safeguard Life.

PRAKASH VERMA
Agent
Ph: (512) 731-4010
pverma@ft.newyorklife.com
https://www.newyorklife.com/agent/pverma
New York Life Insurance Company
6200 Bridge Point Pkwy Suite 300
Austin, TX 78730

Let us work together to help you prepare for a successful financial future for you and your family and help keep the lamp of the hopes and aspirations of you and your family burning.

NEW YORK LIFE Insure. Prepare. Retire.

GMRU 1710579 (Exp: 7/25/2024)

বিস্মৃতি

দেবস্মিতা পাল চ্যাটার্জি

সকালে চোখ খোলার আগেই মাথাটা ভার। টের পেতেই বুঝতে দেরি হলোনা, আজ দিনটা কষ্টে কাটবে। এই season change এর সময় গুলো কিছুতেই বাগে আনতে পারে না বৃন্তিকা ওরফে বিনি। একটা দুটো দিন ভুগতেই হয়। কোনো রকমে চোখের পাতা খুলে মোবাইলে সময়টা দেখে নিলো। 6 টা 10 বাজে, কোনো রকমে নিজেকে টেনে বিছানা থেকে তুললো বিনি।
মেয়েটাও উঠে গেছে মনে হচ্ছে। ঘর থেকে না বেরিয়েও খুট খাট শব্দ কানে আসছে। কিরে! আজ কটায় বেরোবি?
ঘরের বাইরে থেকেই প্রশ্ন ছোঁড়ে বিনি।
কলি, বিনির মেয়ে, উত্তর দেয়, "Practical আছে মা, নটায় classএ ঢুকতে হবে।"
বিনি,–"আজ মাথাটা ধরে আছে, টিফিন দিচ্ছি না, বাইরে খেয়ে নিস।"
কলি– "কি গো! খুব কষ্ট হচ্ছে! আমি কি bunk করব!"
বিনি– "না তোমার আর bunk করে কাজ নেই. এই painkiller খেয়ে শুয়ে থাকি। office এ call করে দেবো।"
কলি– "মা বাড়াবাড়ি হলে কিন্তু আমাকে call কোরো! চলে আসবো। বাবাও বাইরে! তুমি বেশি সাহস দেখিয়ো না!"
মৃদু হেসে বিনি বলে, "না, চিন্তা করিস না।
আকাশ টা কালো হয়ে আছে ছাতা নিতে ভুলিস না।"
কলি– "হুম, তুমি rest নাও আমি বাইরে থেকে lock করে দেবো।"

Bedroomএ এসে, email drop করেই একটা paracetamol মুখে পুরে নেয় বিনি।
মনে মনে ভাবে মেয়েটা কবে যেন এত বড় হয়ে গেলো! সেই ছোট্ট বেলা মাকে ছেড়ে স্কুল যাবে না থেকে আজ college এর 2nd year!
জলের বোতল থেকে এক ঢোকে ওষুধ টা গিলে নিয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়ে বিনি।
মাথার মধ্যে তীব্র কষ্টের সাথে, এ কথা সে কথা ঘুরপাক খেতে খেতে অজান্তে চোখ দুটো বুজে আসে।

একটা সুরেলা আওয়াজ ভেসে আসছে, সিঁড়ির ওপর থেকে। পাশে শাশুড়ি মা, কেমন লাল পাড় শাড়ি! পাশে হাঁটছেন বিনির। দুজনে যেন কিজন্যে ওপরে উঠছে। কিছুতেই ওপর তলা টা আসছে না!
ঘুম ভেঙে যায় বিনির। ঘোর কাটতেই বোঝে calling bell বাজছে...।
নির্ঘাত parcel এসেছে, ফোন করলো না তো! Phone এর দিকে তাকিয়ে সময়ে টা দেখে নেয় বিনি, screen এর ওপরে দুটো missed call কলির।
তিন টে কুড়ি, এতক্ষণ ঘুমিয়েছে!
এত instruction সত্ত্বেও সেই দুপুরে! যদি বাড়ি না থাকতো! মনে মনে parcel এর ছেলেটাকে কি ধমক দেবে, তার rehearsal করতে করতে সিঁড়ির দিকে এগোতে গিয়েই

সিঁড়ির জানলা দিয়ে আকাশের দিকে নজর যায়। কি অস্বাভাবিক অন্ধকার! তার ওপর বৃষ্টি। কে বলবে দুপুর! যেন সন্ধ্যে নেমে গেছে। মাথা টা ভালো লাগছে। অনেক হালকা।
সদর দরজার সামনে এসে looking glass e চোখ রাখে বিনি, নাহ, একজন মহিলা মনে হচ্ছে!
কে রে বাবা এই সময়ে!
কে...?
আমায় চিনবেন না, kindly একটু দরজা খুলবেন? খুব বিপদে পড়েছি।
গলা টা বেশ ভদ্রস্থ, কিন্তু যা দিনকাল! দোটানায় পড়ে যায় বিনি, দরজায় safety latch টা গলিয়ে নেয়।
দরজা অল্প ফাঁক করে প্রশ্ন করে, "বলুন?"
–"কিছু মনে করবেন না, অসময় বিরক্ত করছি। আমি এই পাড়াতেই একজনের বাড়ি খুঁজছিলাম, এত বৃষ্টি! ছাতাও ভুলে ফেলে এসেছি, কিছুতেই ঠিকানা টা পাচ্ছি না। Taxi টাও ছেড়ে দিয়েছি। একদম কাক ভেজা হয়ে গেছি। আপনার পাশের বাড়িও knock করেছিলাম। দরজা খুলল না। তাই বাধ্য হয়েই..."
"কত নম্বর বাড়ি?"
"শিকদার লেন, ১২/B"
"রাস্তার নাম তো ঠিকই বলছেন, কিন্তু এ পাড়ায় সব গোটা number এর বাড়ি, by সংখ্যায় তো বাড়ি নেই!"
বিনি ভাল করে নজর করে মহিলা কে, তারই বয়সী, একটু গোলগাল, চেহারায় অতি সাধারন ভদ্র একটা ছাপ। একদম ভিজে গেছে, পরনে একটা হ্যান্ডলুম শারী। কাঁধে একটা ছোট কালো purse শক্ত করে ধরা বগলের নিচে। ভীষণ অসহায় দেখাচ্ছে মহিলা কে।
"আমি একটু আপনাদের bathroom টা ব্যবহার করতে পারি? Please?"
কি বলবে বুঝতে পারছেনা বিনি, ফোন টাও ওপরে ফেলে এসেছে!
দোনামনা, করে, বলেই ফেলে, "আসুন"
বৈঠকখানা ঘরের টিউব লাইটটা জ্বালিয়ে দেয় বিনি।
মহিলা সদরের সিঁড়ি পেরিয়ে ঘরে ঢুকে আসেন।
এবার আরও ভাল করে দেখা যায় মহিলা কে। নিপাট ভদ্র, শান্ত একটা চেহারা। লম্বায়, বিনির থেকে একটু খাটো, ফুট পাঁচেক হবেন। চোখে মুখে একটা পরিষ্কার অস্বস্তির ছাপ। সাবধানতা বসত, বিনি তাড়াতাড়ি সদর দরজা টা বন্ধ করে দেয়।
"আসুন।"

বৈঠক পেরিয়ে, ভেতরের সবুজ দরজা ঠেলে, অন্দরের উঠান ঘেরা বারান্দা দিয়ে বিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। বাঁ দিকে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির নিচের বাথরুম এ পৌঁছে দেয় মহিলাকে। এই বাথরুমটা বাড়িতে যারা কাজ করতে আসেন তারাই ব্যবহার করেন। বিয়ে হয়ে অবধি এই বাড়িই তাকে বড় করেছে, পাকা গিন্নি বানিয়েছে। নিছক college পড়ুয়া থেকে আজ বিনি এ বাড়ির হৃৎপিন্ড। পাইক পাড়ায় পুরোনো বাড়ি তাদের। কোনো কারণে বরং বলা উচিত, আশীর্বাদে, কলকাতার আধুনিক multistoried building

–এর থাবা এখনো এ অঞ্চলে বসেনি। কেমন যেন সেই ৬০এর দশকের সুখী বাঙ্গালিয়ানার মায়া ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে এ অঞ্চলের বাড়ি গুলো। বেশির ভাগই দোতলা বাড়ি। সেকালের সম্ভ্রান্ত পাড়া বলে এখনো পরিচিতি এ অঞ্চলের। কোনো কোনো বাড়ির অন্দর একটু একটু করে বদলে গেছে আধুনিকতার আঁচে। তাদের নিজেদের বাড়িটাও সেরকম। দোতলায় উঠলে, বাইরের কাঠামোর সাথে ভেতরটা মেলে না।
এ বাড়ির প্রতিটি ইট, বরগা, বিনির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।
Bathroom-এর বাইরেই বিনি দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবতে ভাবতে চোখ চলে যায় উঠানের খোলা আকাশ পেরিয়ে, ছাতের টব গুলোর দিকে।বৃষ্টি বেড়ে গেছে। দোতলার কার্নিশ গুলো যেন বলছে,
"আমি আছি তো।"

মহিলা বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসেন, মুখে একটা স্বাচ্ছন্দের আভাস। শরীরটা একটু নিংড়ে নেওয়া মনে হল।
তড়িতে, একটা বুদ্ধি খেলে যায় বিনির মাথায়। বলে, " আপনি বাইরের ঘরে বসুন,আমি একটা শুকনো কাপড় নিয়ে আসি, যা বৃষ্টি এখন বেরতে পারবেন না। আসলে phone-টিকে করায়ত্ত করার এটাই সুযোগ।
"না, না, লাগবে না।"
বিনি উত্তর বা কর্ণপাত কোনটাই করে না।
বৈঠকখানায় বসিয়ে, ভেতর দিকের দরজা উঠানের দিক থেকে ছিটকিনি তুলে দেয় বিনি। কেমন একটা অনুভুতি হয়, ওই মহিলা বা ভদ্রমহিলা তাকে দেখে হাসছে।

দৌড়ে দোতলায় উঠে শোয়ার ঘরে পৌঁছে যায় বিনি। ত্রস্ত হাতে বাতিল শাড়ির তাক টা হাতড়াতে হাতড়াতে একটা শাড়ি হাতে তুলে নেয়। bedside table থেকে phone টা তুলে, সোজা মেয়ে কে call করে।
কলি– "কেমন আছো? Phone নাওনি! ঘুমচ্ছিলে? আমি চিন্তা করছিলাম।"
বিনি– "তুই কখন ফিরবি?"
কলি– "কেন? কিছু হয়েছে? আজ তো বুধবার আমার chemistry coaching আছে ভুলে গেছ? ৬টা তো বাজবেই।"
বিনি– "এত বৃষ্টি, একজন ভদ্রমহিলা আমাদের বাড়িতে shelter চাইল..."
কলি– "তুমি ঢুকতে দিলে!"
বিনি– "খুব নিরীহ"
কলি– "তোমার দয়ায় আমরা কুপোকাত মা, কবে একটু practical হবে!"
বিনি– "উফ, মানুষের মুখের ওপর আমি পারি না অভদ্র হতে। রাখ এখন, আমি বুঝে নেব।"
কলি– "আমি আসছি।'

নিচে এসে বৈঠকের দরজা খুলে, বিনি দেখে, plastic বেতের বোনা কাঠের easy chairএ ভদ্র মহিলা চুপ করে গুটিয়ে বসে আছেন। বুঝতে দেরি হয়না, ভেজা কাপড়ের জন্যই ওই chair-এ বসেছেন।
বিনি– "কিছু মনে করবেন না, একটু দেরি হল।"

মহিলা– “কি যে বলেন! এই যুগে, অচেনা একজন কে আপনি যা help করলেন!”

শাড়ি আর একটা plastic-এর packet এগিয়ে দিয়ে, বিনি বলে, “change করে নিন। ঠাণ্ডা লেগে যাবে। আমি একটু চা করছি।“

ভদ্র মহিলা আর কথা না বাড়িয়ে বাথরুম এর দিকে এগিয়ে যান।
বিনি রান্না ঘরের দিকে এগোতে এগোতে বাথরুমের ছিটকিনি লাগানোর আওয়াজ শুনতে পায়।
কেমন মনে হয় মহিলা সত্যি খুব সমস্যায় পড়েছেন।

চা এর বাসন নামাতে নামাতে মনে পড়ে আজ সকালে শিখা আসেনি, তার তো সেই সকাল ৭টায় আসার কথা। সন্ধ্যে সাড়ে ৭টায় মাধবি, রান্না করতে আসবে, আকাশের যা অবস্থা সেও না ডুব মারে। Gas জ্বালতে গিয়ে রাজ্যের রাগ গিয়ে পড়ে স্বামির ওপর। সেই কবে তাদের বিয়ে হয়েছে। মাত্র ২০ বছরের মেয়ে তখন বৃন্তিকা, college-এ থাকা কালীনই বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের পর master’s শেষ করে। বাবা কে কথা দিয়েছিলেন তাঁর শৈশবের বন্ধু এবং বিনির শ্বশুর মশাই, মেয়ের পড়াশুনো বিয়ের পর ঠিক করাবেন। কথা রেখেছিলেন তিনি। শাশুড়ির নিত্য নৈমিত্তিক ওজর আপত্তি সত্তেও বিনি 1st class নিয়ে পাশ করে। স্বামী সুকান্ত মানুষ ভাল কিন্তু বড় উদাসীন। বিনির হাত ধরেই একে একে দিদি শাশুড়ি, শ্বশুর মশাই শেষে শাশুড়ি মা পার হন। দিদি শাশুড়ির বিয়োগের পর বিনি চাকরি নেয়। শ্বশুর মশাই অনেক সাথে থেকেছেন। মন খারাপ করে বিনির, বিনি নামটাও তাঁরই দেওয়া। বিয়ের আগে বাপের বাড়িতে সবাই মনা বলে ডাকত। ওদিকে স্বামী! মাসের বেশির ভাগ দিন ব্যবসার কাজে বাইরে! জীবন টা কিভাবে কেটে গেল! আজ বড় ধোঁয়াশা লাগে।

খুট করে ছিটকিনি খোলার আওয়াজে হুশ ফেরে বিনির। চা হয়ে গেছে। দুটো কাপ আর কিছু বিস্কুট একটা প্লেটে নিয়ে বৈঠকখানার ঘরে ঢোকে বিনি। মহিলা, তাঁর দেওয়া শাড়ি টা আধা ভিজে সায়া ব্লাউজের ওপর পরে ঘরে ঢুকল। দেওয়াল ঘরিতে ৪টে বাজতে ৫।
“আপনার নাম টা!” বিনি জিগ্যেস করে।
মিতালি মুখ্যার্জী।, আপনার?
বিনি– “বৃন্তিকা সেন।“
মিতালি নাম শুনেই অপলক কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে বিনির দিকে।
অস্বস্তি হতে থাকে বিনির। বুঝতে পেরে চোখ নামিয়ে নেয় মিতালি।
আপনি কি St. Mary’s Assemblyর ছাত্রী? জিজ্ঞেস করে মিতালি।
হ্যাঁ, আপনি জানলেন কি করে?
আমার প্রথম থেকেই তোকে দেখে কেমন চেনা, চেনা লাগছিল।
এখন তো একদম চেনা। সেই চোখ, মুখের আদল। সব একি রকম রয়ে গেছে। তাঁর থেকেও বেশি তোর মন, কাউকে ফেরাতে পারিস না। আমাকে চিনতে পারছিস না!
বিনি, লজ্জিত মুখে, “ঠিক মনে আসছে না।“
আরে, class 7A তে তোর আমার তো বেশ বন্ধুত্ব ছিল! Bench rotation এর সময় তুই

কত বার জোর করে আমার পাশে বসতিস! তোর বেস্ট ফ্রেন্ড অনিন্দিতা কি রাগ করত! বলেই হেসে ওঠে মিতালি।
হ্যাঁ, আনিন্দিতা, ক্লাস টেন অবধি বিনির best friend ছিল। college-এ আলাদা হয়ে যায়। ঠিকই বলছে মিতালি।
মিতালী– "তোর ইন্দ্রানি কে মনে পরে? কি attitude ছিল ওর ওই বয়েসে! টিচার রাও সামলে চলত।"
হ্যাঁ তাও মনে পড়ছে বিনির। ইন্দ্রাণী যেমন smart তেমনি সুন্দরী ছিল।
কিন্তু একে কিছুতেই মনে পড়ছে না কেন! কি মুশকিল!
মিতালী– "আমাদের class 7 er মাঝেই বিমলা miss retire করলেন। কি ভাল teacher ছিলেন! তারপর English teacher হলেন চন্দ্রিকা mam, আমার তো school যেতেই ইচ্ছা করত না।"
বিনি মনে মনে হিসাব করল, একদম ঠিক বলছে মিতালী। কবেকার কথা! যেন গত কাল এর ঘটনা মনে হচ্ছে। বিমলা miss এর চলে যাওয়া টা যেন মরমে অনুভব করছে বিনি।
একাই বকে চলেছে মিতালী, "আচ্ছা! সেই বন্দনার pen হারিয়ে গেছিল একদিন! কি কাণ্ড! কি নাটক মেয়েটার! রুমাকে কি অপদস্থই না হতে হল সেদিন। headmistress অবধি গিয়েছিল। কি হল রে তারপর! আমি তো পরে কত দিন অসুস্থ ছিলাম, school যাইনি। pen টা পেল?"
বিনির একের পর এক স্কুলের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। সব ঠিক বলছে মিতালী।
কিন্তু...
মিতালী– "কিরে!"
বিনি– "হ্যাঁ!, হ্যাঁ, পেন পাওয়া গেছিল, ওর নিজের bag এই। কিন্তু বলেছিল, পরে কেউ ভয় পেয়ে ফেরত দিয়েছে।"
বিনি– "মিতালী, তুমি 7এর পর কোন section এ ছিলে! মানে 8th থেকে তো section change হত না। তবে আমরা টিফিনে অন্য ক্লাসের পুরনো বন্ধুদের সাথে meet করতাম।"

মিতালির মুখটা কেমন কালো হয়ে গেল। "তুই আমায় তুমি বলছিস কেন রে! একদম আমার কথা মনে নেই! না থাকারই কথা। আমার তো বন্ধুই ছিল না। সবাই avoid করত। শুধু তুই..."
একটু চুপ করে রইল মিতালী,
"আর তোর তো সারা classই বন্ধু। কি হাসিখুশি ছিলি তুই! 1st bench to last bench সবাই তোকে পেলে খুশি।"
বিনির চোখের সামনে 7A classroom টা ভেসে ওঠে। সারা দেওয়াল জোড়া কাঁচের জানলা। সাদা দেওয়াল। পরিষ্কার line দেওয়া desk and benches , রোদ অথবা মেঘ পুরো আকাশ টা চোখের সামনে। জানলার বাইরে বড় মাঠ। তাতে চারা গাছের boundary । রাধাচূড়া, কৃষ্ণচূড়া, শিমূল, কুঁচ গাছের সারি দিয়ে privacy borderএ ঘেরা। পেছনের মাঠে বিশাল এক কাঁঠাল গাছ, chapel, auditorium, tailor room, সব চোখের সামনে ভেসে ওঠে বিনির। দুনিয়ার দুঃখ আর struggle থেকে আড়াল করা এক আনন্দের,রুপকথার জগৎ মনে হত স্কুলটাকে। সেই বৃন্তিকা আর আজকের বিনি! মিতালী

ছাড়া কেউই বোধহয় মিলিয়ে নিতে পারবে না। পোড় খাওয়া গৃহিণীর মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেছে প্রাণোচ্ছল বৃন্তিকা।
খুব লজ্জা করছে বিনির। এত চেষ্টা করছে মিতালী, সব মনে পড়ছে শুধু কেন ওর কথা টুকু মনে পড়ছে না! মনে করতে পারলে বাঁচে বিনি।
মিতালী– "খুব ভাল করেছিস চা টা।" সম্বিৎ ফেরে বিনির।
জোর করেই তুই বলা শুরু করে বিনি। "বললি না তো! কোন section ছিল তোর!"
মিতালী– " নাহ। তোর সত্যি মনে নেই দেখছি। আমার তো class 7 এর শেষের দিকেই চলে যেতে হল।"
"অন্য কথাও চলে গেছিলি"? বিনি জিজ্ঞেস করে। এবার নিজেকে একটু সান্তনা দেয়। ওই শেষ ক'বছরই বিনি school এর popular girl হয়ে উঠেছিল, gradeও ভাল করতে শুরু করেছিল। তাই হয়ত মনে নেই।
বৃষ্টি টা ধরে এসেছে। মিতালী বলল, "এবার উঠি রে। আজ আর সে ঠিকানা খুঁজে পাব বলে মনে হয় না।
এবার বেরিয়ে পড়ি। কেমন সন্ধ্যে হয়ে গেছে।"
দেওয়াল ঘড়িতে পাঁচটা দশ।
"একটা uber ডেকে নে।" বিনি বলল
মিতালী– "আমি খুব সেকেলে রে। এখনো ওসব পারি না।"
"আমি book করে দেব?"–বিনি
মিতালী– "না না , ঠিক চলে যাব।"
বিনি– "একটু এগিয়ে Main road থেকে taxi পেয়ে যাবি। আর একটু বস। আমার মেয়ের সাথে আলাপ হয়ে যাবে।"
মিতালী– "ওমা! তোর আবার মেয়ে! হেসে ওঠে মিতালী। তুইই তো এখনো ছোট্ট মেয়ে।"

বিনি কেমন অপ্রস্তুত হয়ে যায়। জিজ্ঞেস করে, "তোর বাড়ি কোথায়? ছেলে মেয়ে?"
মুচকি হেসে মিতালী বলে, "একটা কাগজ দে তো। আমার ফোন নাম্বার টা দি তোকে। আমার ফোন টার চার্জ নেই। switch off হয়ে গেছে, যদি আমার কথা সত্যি মনে করতে পারিস তবে কল করবি। নাহলেও আমি জানি দেখা তো হবেই।"
Center table থেকে ছোট্ট notepad আর pen তুলে মিতালির দিকে বাড়িয়ে দেয় বিনি। Number লিখে কাগজ টা ছিঁড়ে ভাঁজ করে টেবিলের ওপর রেখে দেয় মিতালী।
"চলি রে।"
বিনি– "আবার আসিস, বাড়ি তো চিনেই গেলি।"

মিতালী বেরিয়ে যায়। বিনি দরজায় দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে মিতালী কাঁধে ছোট্ট কালো bag আর অন্য হাতে ভিজে কাপড়ের plastic নিয়ে এগিয়ে যায়। রাস্তার ওপারে গিয়ে হাত নাড়ে মিতালী। আবার পিছন ফিরে হাঁটতে হাঁটতে অন্ধকারে মিলিয়ে যায় মিতালী।
বিনি ভেতরে ঢুকে দরজা দিয়ে, বৈঠকখানা ঘরেই সোফায় বসে পড়ে।
ঘরটায় আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে নেয়। কড়ি-বরগার ceiling, সবুজ খড়খড়ি দেওয়া জানলার কপাট, ভেতরের দিকে লম্বা কাঁচের পাল্লা। এই বাড়িতে ঢুকে প্রথম বাড়ির প্রেমেই পড়েছিল বিনি। দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখ পড়ে কোনে রাখা আরামকেদারা টার

ওপর। ঘরের সব আসবাব বদলে সেই পুরনো কেতায় নতুন décorএ সাজিয়ে নিয়েছে বিনি। Leather sofa, কাশ্মিরি কাজের table, দামি oil paintings, ভারি brocade পর্দা। শুধু সেগুন কাঠের বইয়ের আলমারি আর কোনে রাখা শ্বশুর মশাইয়ের প্রিয় আরাম কেদারা টা প্রাণে ধরিয়ে বাতিল করতে পারেনি বিনি।
আজ কিছুতেই কেন মনে করতে পারল না মিতালী কে! পুরনো টা কি ফুরিয়ে যাচ্ছে! মিলিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে!

ভাবতে ভাবতে চোখ পড়লো আরাম কেদারাটার দিকে। যেটায় বসে ছিল মিতালী। হঠাৎ অবস হয়ে গেল বিনির সারা শরীর। বিদ্যুৎপৃষ্ঠের মত এক ঝলকে মনে পড়ে গেল সব। দুগাল বেয়ে নোনতা দুফোঁটা জল অজান্তেই কাঁধে এসে পড়লো। কেউ যেন একটা পর্দা দিয়ে রেখেছিল এতক্ষণ স্মৃতির মাঝে। পরপর মনে পড়তে থাকলো মিতালির সব কথা। মিতালী 7A তে বিনিদের ক্লাসে এসেছিল। ছোটবেলা থেকে ওই স্কুলেই পড়তো মিতালী। ঠিক বিনির মতই। হঠাৎ ক্লাস সিক্স থেকেই মিতালী মাঝে মধ্যেই অসুস্থ হতে থাকতো। কেউ তেমন খোঁজ রাখত না। মাঝে মাঝে হয়ত বিনিরই মনে হত ওই মেয়েটা আসেনা কেন! সেভেনে মিতালী যখন একই sectionএ আসল, সেই রোগা ছিপছিপে মিতালির চেহারায় অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে। কেমন অপ্রকৃতিস্থ ফোলা চেহারা মিতালির। সবাই সরে সরে থাকতো মিতালির থেকে। বিনি বরাবরই sensitive মেয়ে ওই বারো বছর বয়েসেও কেমন যেন অন্যদের মত দূরে থাকতে পারত না মিতালীর থেকে। কেউ যখন বসতো না মিতালীর পাশে। বিনি এসে বসতো।
একদিন জিগ্যেস করল," কি হয়েছে তোর মিতালী?"
মিতালী বলল "আমার খুব শ্বাস কষ্ট হয় রে। ডাক্তার বলেছে আমার asthma আছে, তাই অনেক steroid নিতে হয়। তাই আমি এমন হয়ে গেছি।"
বিনির মনটা সেদিন আজকের মতই মেঘলা হয়ে গেছিল। "দেখিস তুই একদম ভাল হয়ে যাবি।"
শুনে মিতালী অস্ফুটে হেসেছিল।
এরপর মিতালী কখনো আসত আবার বহুদিন আসত না। যখন আসত তখন বিনি চেষ্টা করত মিতালীর পাশে বসতে। ভাল লাগত না বিনির, আনিন্দিতা, সুকন্যাদের সাথে বসলে সারা দিন কত মজা, তবুও কেমন একটা কর্তব্য ভেতরে পেয়ে বসেছিল বিনিকে। শেষ যেদিন বিনি মিতালী কে দেখেছিল সেদিন মিতালীর গলার স্বর টাও যেন বদলে গেছিল। কেমন দম বন্ধ লাগছিল বিনির নিজেরই।
তার এক সপ্তাহ পরে খবর এসেছিল স্কুলে, মিতালী আর নেই। অনেকে গেছিল মিতালীকে শেষ বিদায় জানাতে। বিনি পেরে ওঠেনি মিতালীদের বাড়ি যেতে। বাড়িতে মাকে জরিয়ে ধরে খুব কেঁদেছিল বিনি।

সব, সব মনে পরে গেছে বিনির। নড়ার ক্ষমতা নেই বিনির। কোনরকমে হাত বাড়িয়ে মিতালীর ফোন নম্বর লেখা কাগজ টা টেনে নিল। নিশ্চয়ই ভুল হচ্ছে বিনির। ভাঁজ খুলে দেখল কাগজ টা তাদের স্কুলের সাদা দেওয়ালের সাথে হুবহু মিলে গেল। একটা দাগও নেই। মাথা যন্ত্রণায় ফেটে যাচ্ছে বিনির। আরামকেদারা টার থেকে চোখ টা কোন ভাবে সরাতে পারছে না বিনি। ওটা বিনির দিকে তাকিয়ে বলছে,
"আমি আছি তো!" ||

একটি ডাকাতির গল্প

কেকা বসুদেব

দুপুর তিনটে সাড়ে তিনটে নাগাদ সব কাজ সারা হয়ে গেলে, আমাদের দোতলার টানা বারান্দায়- ঠাকুমা, আর তাঁর জা-ননদদের এক জমাটি আড্ডা বসত। সে আড্ডা- রঙিন গুজবের মৌতাতে ম ম করতো। ইশকুল থেকে ফিরে ছোটঠাম্মার কোলে মাথা দিয়ে পিঠে সুড়সুড়ি খেতে খেতে- চোখ গোলগোল, আর কান খাড়া করে সে সব শুনতাম। তাঁরা ভারী ভালো ছিলেন, কক্ষনো মা-পিসিদের মত চোখ পাকিয়ে, 'এখানে কি চাই ?' বলে উঠিয়ে দিতেন না।

মজলিশে সম্ভব অসম্ভবের সীমানা বলে কিছু থাকতো না, যুক্তি-তক্কোকে কুলোর বাতাস দিয়ে তাড়িয়ে- তবে এই আড্ডার রস উপভোগ করা যেত। নানা বিপজ্জনক আইডিয়ার চাষও হত সেখানে। যেমন- বড় পিসিঠাম্মা বলতেন, নারীর স্বাবলম্বীতা- কিছু কুচুটে আর হিংসুটে মেয়েদের তৈরি এক বেজায় ফালতু কনসেপ্ট! যারা জীবনে কোনো সুখ পায়না, সাত সকালে দুটো নাকে মুখে গুঁজে, ফুটানির থলে কাঁধে- ভিড় বাসে যুদ্ধ করতে করতে আপিস যায়, আর বসের মুখনাড়া খায়- তারাই নাকি ফ্রাস্ট্রেশন থেকে ওসব রটায়।
জানতে চাইবেন নিশ্চই, জীবনের সুখগুলো কি ? সেগুলো হল- সকাল থেকে সংসার ধম্ম সেরে - একটি ছোট্ট দিবানিদ্রা; উঠে আয়েশ করে একটি পান সেজে মুখে পোরা, গরমকালে গল্পগুজব করতে করতে কাঁথা পাতা, নুন শো দেখতে যাওয়া...
শীতের দুপুরে মিঠে রোদে পিঠ দিয়ে বসে কমলালেবু খেতে খেতে উলবোনা, ইডেনে দলবেঁধে এক আধ দিন টেস্ট ম্যাচ দেখা... সন্ধ্যেবেলা সব কাজ মিটিয়ে এক সঙ্গে ভালো সিরিয়াল দেখা, কি রেডিওর নাটক শোনা...
বাড়ির তরুণী প্রজন্ম শুনে অনুকম্পার হাসি হাসত ; আসলে বড় দুঃখ থেকে পিসিমা এই কথাগুলো বলেন, তাঁর চার চারটে গুনবতী মেয়ে - সাত সকালে পড়িমরি মোটাসোটা চাকরি করতে বেরিয়ে যায়, আর তিনি- ইয়া বড় বাড়িতে একা একা বোর হন। তাই চাকুরে রমণীকুলের ওপর ভদ্রমহিলা হাড়ে হাড়ে চটা।

এই আড্ডাতেই পিসিঠাম্মার মুখে শুনেছিলাম- তাঁর এক মলুঠাকুরঝির কান্ড। মলুর আসল নাম- মল্লিকা। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স। একেবারে খাঁটি বরিশালি স্পেসিমেন। প্রথমে চেহারা- বৃষস্কন্ধ, শালপ্রাংশু, মহাভুজ ... ইত্যাদি তাবৎ সংস্কৃত পালোয়ানী বিশেষণই তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তবে মুখশ্রী বেশ তরতরে। সঙ্গে মানানসই স্বভাব- খিল দিয়ে বাঘ তাড়াতে পারে, কিন্তু আখ পেষাই কলে পেষাই করলেও তাঁর থেকে এক ফোঁটা রসও মিলবে না! সাজ পোশাকও ইউনিক ; শাড়ির সঙ্গে শার্ট আর পায়ে বারো মাস কেডস। তাঁরা তিন বোন, প্রত্যেকে সুচাকুরে, আর জেনেটিক্যালি ভয়ংকর পুরুষ বিদ্বেষী। তাঁদের বাপ- সারা জীবন বউ-মেয়েদের কাছে হেনস্থার একশেষ হবার পর ইদানিং মরে বেঁচেছেন। মা টি নেহাত সেকালে উইমেন্স লিবের কনসেপ্ট ছিল না, তাই বে থা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু মলুরা তিন বোন আর ও রাস্তায় হাঁটেনি। সবাই

বলে- ভাগ্যিস হাঁটেনি, তাই নাকি কিছু পুরুষের বংশ পরম্পরায় জীবন বেঁচে গেছে!

যাই হোক, বাজে কথা বাদ দিয়ে এবার কাজের কথায় আসি; এটা যে সময়ের ঘটনা, যখন পশ্চিমবঙ্গে বেশ একটা ডামাডোল চলেছে। পুলিশ, নকশাল, রাজনীতিবিদ সবাই মিলে বেজায় গুলোচ্ছেন। মলু ডুয়ার্সের এক টাউনের কলেজে ফিলোজফি পড়াতো, আর লোকালয় থেকে খানিক দূরে একটা ছোট ছিমছাম বাড়িতে একলাই থাকতো। সকালে দুধভাত খেয়ে কলেজ যেত, ফেরার সময় মিডিয়াম পেসে ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরত, ওটা নাকি এক্সারসাইজ ! সন্ধ্যায় সখ মত কিছু রান্না করে খেয়ে, খানিক রেডিও শুনে জলদি ঘুমিয়ে পড়ত। একটা কাজের লোক পর্যন্ত ছিলনা, কারণ- নিজের কাজ অন্যে করবে- এটা তাঁর না পসন্দ। আর কোনো মহিলা হলে সবাই চিন্তা করতো- একলা মেয়ের এমন একটেরে বাড়িতে থাকা কি উচিৎ ? কিন্তু মেয়েটি মলু বলেই- কেউ বিন্দুমাত্র চিন্তিত হত না।

সেবার হেমন্তে, বড় শহরের অশান্তির ঢেউ পাহাড়তলির ছোট্ট টাউনেও পৌঁছাল। গুজব শোনা যেতে লাগলো- নকশালদের বড় বড় কিছু মাথা নাকি প্রশাসনের হুড়ো খেয়ে সেই টাউনে আত্মগোপন করেছেন। তাঁদের পিছু পিছু এসেছে- নকশাল সেজে খুন রাহাজানি করে বেড়ানো খান কতক বাছাই গুন্ডা বদমাশ। টের পেয়ে কিছু বাঘা পুলিশকেও টাউনের ছোট্ট থানায় পোস্টিং করা হয়েছে- মানে, কেস গুরুচরণ !

এবার মলুকে সবাই বলতে লাগলো - অমন ধ্যাদ্ধেড়ে গোবিন্দপুরে আর থাকা উচিত নয়, বরং কলেজের হোস্টেলে আপাতত থাকুক। মলু পাত্তাও দিল না, শুধু একটি বেঘো মার্কা বাঁশের লাঠি নিয়ে যাতায়াত শুরু করল; পাকা বাঁশের সে লাঠি লোহা দিয়ে বাঁধানো, তার ভয়াবহ চেহারা দেখে সকলে প্রমাদ গণলো- এর ঘা যার ওপর পড়বে তার কি দশা হবে ! আবার মলু নাকি ছাত্র জীবনে রীতিমত লাঠি খেলা শিখেছে। যাই হোক, জীবন পুরনো রুটিনেই চলতে থাকে, শুধু ফেরার সময় লাঠি বাগিয়ে ধরে মলু একটু দ্রুত লয়ে দৌড়য়- বেলা ছোট হয়ে এসেছে, দিনকালও ভালো নয়, কি দরকার রাত করার ...

সেদিন, ক্লাস শেষে, কলিগদের জোরাজুরিতে ইভিনিং শোতে সিনেমা দেখে, মলু যখন নিজের ডেরায় পৌঁছল- তখন বেশ রাত হয়ে গেছে; এক চিলতে বাগানের কাঠের গেটটা হাট করে খোলা...
ব্যাপার কি ? মলু গুঁড়ি মেরে ভেতরে ঢোকে...
চোখে পড়ে- পেছনের জানলা দিয়ে ভেতরে উঁকিঝুঁকি মারছে এক ষন্ডা গোছের মানুষ... নির্ঘাৎ নকশাল সাজা গুন্ডা ! মলু নিঃশব্দে চিতার মত ঝাঁপিয়ে পড়ে... পাকা হাতের- বেঘো বাঁশের খান কতক মোক্ষম বাড়িতে গুন্ডাটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে...
এবার মলু টর্চ জ্বালে- ইয়া মুশকো মাঝবয়সী এক জোয়ান, মাথায় কদমছাঁট চুল, মিলিটারি গোঁফ... বড়সর গুন্ডা না হয়ে যায় না! মোক্ষম মার মেরেছে, দু এক জায়গা থেকে রক্তও গড়াচ্ছে...
মলু দরজা খুলে ওই দেড়মণি লাশকে টেনে হিঁচড়ে ঘরে তোলে... খানিক চিন্তা ভাবনা করে পেছনের অব্যবহৃত বাথরুমে মানুষটাকে ঢুকিয়ে দেয়। ক্ষততে লাল ওষুধ দিয়ে,

মাথার কাছে এক ঘটি জল রাখে। তারপর আচ্ছা করে চারিদিকে তালাচাবি দিয়ে থানার পথ ধরে...

থানায় তখন মেজোবাবু, সেজোবাবু আর কজন কনস্টেবল মিলে গুলতানি করেছে... বেশ শান্তিপূর্ন আবহাওয়া...
মলু টাইফুনের মত আছড়ে পড়ে- 'বলি, আপনাদের দারোগাবাবু কোথায় ? এখানে বসে গল্প করছেন, আর সাধারণ মানুষের বাড়িতে গুন্ডা বদমাশ ঢুকে আসছে, এসব হচ্ছেটা কি ?'
- 'বড়বাবুর এখন অফ্ ডিউটি। কিন্তু গুন্ডা বদমাশ কোথায় ঢুকলো ?' মেজোবাবু মোলায়েম স্বরে বলেন।
-'আমার বাড়িতেই একটা ঢুকেছে, বাঁশের বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে খবর দিতে এলাম !'
থানার পুলিশ তো বটেই, এমন কি লকআপের কয়েদিগুলো পর্যন্ত মলুকে সমীহের চোখে দেখে...

মেজোবাবু, সেজোবাবু সদলবলে চললেন- ডাকাত ধরতে। মলু চলল আগে আগে- বাঁশ হাতে দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডারের মত...

বাথরুমের তালা খুলে মলু আগে উঁকি মারে- ব্যাটার জ্ঞান ফিরেছে, দেওয়ালে ঠেস দিয়ে কোঁকাচ্ছে... হতভাগা ! যেমন কর্ম তেমনি ফল !
মলুর কাঁধের ওপর দিয়ে মেজোবাবু উঁকি দিয়ে ডাকাতের চেহারা দেখে আঁতকে ওঠেন - এ কী ! এ যে দারোগাবাবু !

মলুর বিস্ফারিত চোখের সামনে পুলিশরা ধরাধরি করে তাঁদের বসকে বৈঠকখানার কৌচে এনে শোয়ায়...
তারপর যেন টাইফুন বয়ে যায়- জল লাও, ডাক্তার লাও, ওষুধ লাও,দুধ লাও...
দারোগাবাবু খানিক সামলানোর পর আসল ঘটনা জানা গেল, নকশাল ধরতে-
কলকাতার এক বাঘা থানা থেকে অভিজ্ঞ দারোগাবাবুটিকে- মলুদের এঁদো থানায় সম্প্রতি পাঠানো হয়েছে। তিনি নাকি আরব্য রজনীর সুলতান- হারুন অল রশীদের কায়দায় প্লেন ড্রেসে রাতের বেলা চারিদিকে টহল দিয়ে বেড়ান। মলুর একটেরে বাড়িটির দিকে তাঁর বেশ কিছুদিন নজর পড়েছে- গা ঢাকা দেওয়ার আদর্শ জায়গা ; তাই সেদিন বাড়ি অন্ধকার দেখে একটু উঁকিঝুঁকি মারতে এসেছিলেন...
মলু বেজায় অপ্রস্তুত, কিন্তু দারোগাবাবু ঘাড়ে হাত বুলোতে বুলোতে হেসে বললেন, 'একদম লজ্জা পাবেন না, আপনাদের মত নারীদের দেখেই তো গুরুদেব 'সবলা' কবিতাটি লিখেছিলেন ! যা বাঁশ পেটা করেছেন, সারা জীবন মনে থাকবে !'

গল্প শেষে পিসি ঠাম্মার কাছে জানতে চাই- 'মলুঠাম্মা তো এখন ঝাড়গ্রামে থাকে, না ?'
- 'হ্যাঁ!'
- 'তাঁর বর তো জিয়াগঞ্জে পুলিশ ?'
- 'হ্যাঁ; তো ?'

তো, তো অনেক কিছু ! তখন বছর দশেক বয়স, আর ছোট নই, লুকিয়ে চুরিয়ে বড়দের বই পড়ে - তাঁদের বিটকেল মতিগতির অনেক খবরই রাখি !
সবজান্তার মত হেসে বলি- 'ওহ্ ! মলুঠাম্মা বুঝি ওঁর হবু বর- পুলিশদাদুকে বাঁশ পেটা করেছিল সেদিন ?'
- 'চুপ চুপ, ও কথা কইতে নাই, শুনলে পুলিশদাদু লক আপে ভইরা দিবে কিন্তু !'

ঝরার বেলায়

প্রবাল দাশগুপ্ত

ভোরের ঝরা শিউলি বলে
বিদায় আমার আজ এ পলে,
মল্লিকা রয় ডালে ডালে
নতুন সকাল আসে ।
হাসনুহানার গন্ধে মাতে,
কোন মধুকর বসবে তাতে ,
নতুন নেশার আশে আশে
দিগন্ত আজ হাসে ।
হিমেল পরশ লাগলো গায়ে
কোকিল কুহু কুহু ডাকে ,
বসন্তেরই আশে ।
ঝরার বেলা বিদায় কালে
আসবি কারা আমার দলে,
চেয়ে থাকি ডালে ডালে ,
তারা শুধুই হাসে ।
সন্ধ্যা রাতের চামেলী কয় ,
ঝরার কালে নেবো বিদায় ,
রবো রে তোর পাশে ।।

মহর্ষী

পাপিয়া দাসগুপ্ত

আমি যামিনী, তুমি শশী ,
আমি মানব , তুমি মহর্ষী।
এক পলকে হারিয়ে গেলে,
জানিনা কোথায় কি যে পেলে !
আমি শূন্য গৃহে আপন মনে।
রচি মায়াজাল ক্ষনে ক্ষনে।
যদি না পারো ফিরতে ,
পারো কি আমাকে নিয়ে যেতে ?
এই না, এই না বলে,
শেষমেশ তুমি চলে গেলে ?
ওওও আমিতো ভুলেই গেছি ,
আমি যামিনী , আর তুমি শশী ,
তুমি যে আমার কোলজোড়া মহা ঋষি।

FINANCIAL
PROFESSIONAL

JYOTI MISTRY

CALL FOR APPOINTMENT
757-735-2853

THE BEST SERVICE

I have successfully helped families and business to identify and reach their financial goals. I empower every family with financial literacy on how to protect and maximize their finances, and protect from uncertainties of life.

OUR
SERVICES

- Estate Planning
- College Saving Plan
- Tax Strategies
- Alternative Investment
- Retirement Plan Tax Free
- Business Opportunity

And More

JM CONSULTANCY, INC.
Financial Services

A New Financial Attitude, Insuring Your Future....Today

বেগুনের বেগম বাহারী

শ্রেয়সী দত্ত ভট্টাচার্য্য

এটি আমার ঠাকুমার একটি সহজ পদ্ধতির রান্না। যত কম সময়ে রান্নার গ্যাসের সামনে থেকে করা যায়। ঠাকুমা বলতেন, আমরা মেয়েরা সংসারের অনেকটা সময় রান্নাঘরে কাটাই, তাই আমাদের কিছু মূল্যবান সময় আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারি এই রকম রান্নার মাধ্যমে।

বেগুন এমন একটি সবজি, যা বিভিন্নভাবে রান্না করে ভাত বা রুটির সাথে খেতে ভালোই লাগে, বিশেষ করে শীতকালের দুপুরে বা বৃষ্টির একটি রাতে।

উপকরণ:

বড় সাইজের দুটি বেগুন,

দুই চামচ সর্ষের তেল, স্বাদ অনুযায়ী নুন , বিট নুন, পাঁচশো গ্রাম টক দই , দুই চামচ ভাজা মশলার গুঁড়ো , (শুকনো খোলায় ভাজা গোটা ধনে, জিরে, শুকনো লঙ্কা ভাজা করে গুঁড়ো করা), দুই চামচ চিনি (স্বাদ অনুযায়ী), কাঁচা লঙ্কা কুঁচি, কাশ্মীরি লংকার গুঁড়ো আর বরফের কিছু টুকরো।

প্রণালী:

১) বেগুনীর মতো লম্বা ও পাতলা করে কেটে নিয়ে নুন মাখিয়ে তিন মিনিট রেখে দিতে হবে। (এখানে একটি কথা বলে রাখি, বেগুনের যে কোনও রান্না, সে ভাজাই হোক বা ঝোল , বেগুনটি কাটার আগে জলে দিয়ে ধুয়ে নিতে হয়। কারণ কাটার পর ধুলে পরে কড়াইতে ভাজতে বেশি সময় লাগে।)

২) এরপর একটি কড়াইতে অনেকটা পরিমান সর্ষের তেল দিয়ে গরম করে বেগুনের টুকরো গুলো ছাঁকা তেলে ভেজে নিয়ে একটি টিসু পেপারে দু-তিন মিনিট রেখে দিতে হবে।

৩) আর একটি পাত্রে পাঁচশো গ্রাম টক দই, বরফের টুকরো, স্বাদ অনুযায়ী নুন, বিটনুন ও চিনি দিয়ে ভালো করে ফেঁটিয়ে দশ মিনিট রেখে দিতে হবে। তারপর তার মধ্যে ভাজা মশলার গুঁড়ো, দু' চায়ের চামচ সর্ষের তেল, ধনে পাতা কুঁচি , কাঁচা লঙ্কা কুঁচি দিয়ে আবার দশ মিনিট রেখে দিতে হবে। তারপর বেগুন ভাজার টুকরোগুলো দিয়ে ভালো করে মেখে, শক্ত করে ঢেকে ফ্রিজে আট থেকে দশ ঘন্টা ঢুকিয়ে রাখতে হবে।

পরিবেশন:

পরিবেশনের সময়ে উপর থেকে ধনে পাতা ও লঙ্কা কুঁচি, সর্ষের তেল ও লংকার গুঁড়ো ছড়িয়ে ভাতের সাথে পরিবেশন করলে ভালো লাগবে।

শেষ চেষ্টা

মৈত্রেয়ী চক্রবর্তী

একটা অদ্ভুত ব্যাথা সারা শরীরে নিয়ে চোখ মেলার চেষ্টা করে নির্মলা। ঘোর কাটেনি; কিছুই বুঝতেপারছে না, এখন দিন না রাত, সে কোথায় রয়েছে, কিচ্ছু না। শুধু সারা শরীর যেন প্রচন্ড ভারি লাগছে।মনেহচ্ছে, সে আর কোনোদিন নড়তে পারবে না। চোখের পাতাও মোটা হয়ে গেছে। চোখ বুজে ভাবার চেষ্টাকরে কিন্তু সব চিন্তা গিঁট পাকিয়ে গিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

কিছু মানুষ চেনা চেনা ভাষায় কথা বলছে, গলা নীচু করে। একটা কর্কশ পুরুষালী হাত, যতোটা সম্ভবমোলায়াম ভাবে তার ঠোঁটের কষ গড়িয়ে নামা জলটা মুছিয়ে দিচ্ছে। কী হচ্ছে এখনও বোঝার ক্ষমতা নেইনির্মলার। শুধু কষ্ট হচ্ছে সেটুকুই অনুভব করার শক্তি যেন অবশিষ্ট আছে।

আজ চোখ পুরোপুরি মেলতে পারল নির্মলা। নিজের চিন্তার শক্তি ফিরে এসেছে; যে ঘরটায় সে রয়েছেআপাততঃ, প্রায় আসবাব বিহীন সে ঘরটা চেনা নয়। কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবেই তাকে রাখাহয়েছে। ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়ে নিজেকে জাগায় নির্মলা। তাকে উঠতেই হবে, মনে করতেই হবে কীঘটেছিল তার সাথে। এখানে এভাবে পড়ে রয়েছে, খুব খারাপ কিছু কি ঘটে গেছে তার সাথে? নাকি, এবারে ঘটবে? খুব ধীরে বিছানা ধরে ধরে টেনে তোলে নিজের দেহটা। দুই হাতে মুখ ঢেকে কিছুটা সময়দেয় নিজেকে। যারা তাকে এখানে এনেছে তারা কে নির্মলা আজও বুঝে উঠতে পারেনি। কতোগুলো দিনএভাবে পড়ে আছে, তাও মনে করতে পারছে না। শুধু, একটা ব্যাপার আবছা আবছা মনে জাগছে, এ'কদিনে যে ভাষাটা তারা বলছে, নির্মলার কানে এসেছে, সেটা বাংলা হলেও, শহুরে ভাষা নয়। নির্মলারগ্রামে যে বাংলায় কথা বলত তারা এ যেন অবিকল সেই টান। আহ্, সেই ভাষা তাদের হারিয়ে যাওয়াদিনের ভাষা।

নিমি, বছর চোদ্দর মেয়েটা তার আট বছুরে ভাই এর হাত ধরে নিজের গ্রাম, ঘর বাড়ী ছেড়ে এসে দাঁড়ায় এক অজানা শহরে। বাপ, মা কোনোদিন ফিরবে না জেনেও শুধু ছোট ভাইয়ের মন রাখতেই তাকে নিয়ে শহরে এসেছে। কি যেন এক আন্দোলনে জড়িয়েছিল তাদের গ্রামের অনেকর সাথে নিমিদের বাবা মা।কিন্তু, লোক মুখে শুনে শুনে নিমি বুঝেছে ওসব আন্দোলন টান্দোলন গুটিয়ে গেছে, নেতারা সব হাওয়া, তবে তাদের বাবা মা সহ গ্রামের বহু মানুষই 'নিখোঁজ'। সেই নিখোঁজদের পরিবারের অনেকেই শহরে ভাগ্যফেরাতে ছুটতে শুরু করেছে; হয়ত তাদের মনেও এই ছোট ছেলেমেয়ে দুটির মতো আশা ছিল যে, খুঁজে পাবে হারিয়ে যাওয়া পরিজনদের। নিমি, তার ভাইকে নিয়ে, তেমনই এক মণি কাকার সাথে শহরে আসে।সেখানে, একটা বস্তিতে প্রথম ক'দিন ঠাঁই হয় ওদের। গ্রামের ইস্কুলে পড়ত নিমি। তার নিজের আগ্রহেই সে ইংরেজী পড়তে শিখেছিল। শহরে, কতো রকম লেখা, হাঁ করে পড়তে থাকে নিমি, নিজের মনে মনে ইংরেজী লেখাগুলি উচ্চারণ করে করে বোঝার চেষ্টা করে তাতে কি লেখা রয়েছে। ওই

মণি কাকার পক্ষে তাদের দুটিকে খাওয়ানো পরানোর উপরন্তু সুরক্ষা দেওয়াও সম্ভব ছিল না। ফলে, একটা বড় মন্দিরের সামনে ভিক্ষে করতে বসিয়ে দেয়। নিমিদের একটুও ইচ্ছে করত না সেসব করতে। তবু, দিন শেষে বেশ রোজগারও হতো, আর কোনো কোনো দিন কাঙালি ভোজন হলে বেশ ভালোটা মন্দটা পেট ভরে জুটত। ভিক্ষে করতে করতেই নিমি তার ভাইকে নিয়ে কাজ জুটিয়ে নেয়, রাস্তার ধারের একটা খাবারের দোকানে। সে রাঁধুনিকে সাহায্য করত আর তার ভাই খদ্দের ডাকত। সেখান থেকেই দুই ভাইবোনের জীবন অন্যমোড় নিতে শুরু করে। নিমি দেখত তার ভাই, তাদেরই গ্রামের বেশ কিছু ছেলেপিলেকে ঠিক জুটিয়ে ফেলেছে। তাদের হাবভাব নিমির পছন্দ হতো না বলে দূরত্ব বাড়তে শুরু করে দু'ভাইবোনে। নিমি ওইদোকানে বেশ কিছু বিদেশী কাস্টমার আসতে দেখেত, মাঝে মধ্যে সাহস করে তাদের 'গুড মর্নিং' বা 'থ্যাঙ্কইউ' এসব বলে অনেকেরই চোখে পড়েছিল।

একদিন, এক দিদিমণি তাকে নিয়ে যায় একটা হোমে। যেখানে নিমির মতো ছেলেমেয়েদের জীবনে টিকে থাকার লড়াই শেখানো হয়। ভদ্রভাবে, মাথা উঁচু করেবাঁচা। তা নাহলে, হায়না শকুনের দল থাবা গেড়ে বসে থাকে নিমিদের মতো ছেলেমেয়েদের বিপথে টানার জন্য। নিমির ভাই অবশ্য সে হোম থেকে কয়েকদিনের মধ্যেই পালায়। নিমি কষ্ট পেলেও যেন বুঝেছিলএমনটাই ঘটবে; তাই, ভাইএর জন্য শোক করে সময় নষ্ট না করে, নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছিল। সুন্দর করেকথা বলা, ঝরঝরে ইংরেজী বলা, ভদ্রভাবে খাওয়া আরোও কতো কিছু শহুরে কেতা শিখে নিমি বেশ স্মার্টহয়ে উঠেছিল। নিমি বুঝেছিল, তার যেহেতু প্রথাগত বিদ্যা নেই, তাকে চটকদার হয়ে কাজ পেতে হবে, এবং সে কাজ যাতে কোনোমতেই হাতছাড়া না হয় তার চেষ্টাও করতে হবে।

নিজের মুখশ্রীর ওপর কারো যেমন হাত নেই, তেমনই আজকের দিনে লোকের চোখে সুন্দর হযে ওঠা কোনো ব্যাপারই না। শুধু , উপযুক্ত সাজ, পোশাক, এবং শরীর চর্চা করে সুন্দর চেহারা করা শিখতে হয়। জানতে হয় কীভাবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে হয়; ব্যস। নিমি, এসবগুলো শেখার পাশাপাশি আরোও বেশ কয়েকটা ভাষাও শিখে নিয়েছিল। কয়েক বছরের মধ্যেই কাজ পাবার উপযুক্ত হয়ে ওঠে সে। একটা ট্রাভেল এজেন্সিতে টুরিস্ট গাইডের কাজ পেয়ে গেলো বেশ চট করেই। শহরের বিভিন্ন ঐতিহাসিক বাড়ী, জনপ্রিয় জায়গা, ঐতিহ্যবাহী খাওয়া দাওয়া এমন অনেক রকম ট্যুরেই ডাক পেত সে। মূলতঃ বিদেশী ট্যুরিস্ট থাকলে নিমি অপরিহার্য হয়ে উঠছিল নিজের গুণেই। কিছুদিন সেখানে কাজ করে নিমির বুদ্ধি খুলে যায়, ট্রাভেল এজেন্সির হয়ে কাজ করার পাশাপাশি নিজেই কার্ড ছাপিয়ে, প্রাইভেটে কাজ শুরু করে। বেশ চলছিল নিমির দিনগুলো। যদিও সেকাজ করছে, ভালো টাকা রোজগার করছে, ভালো জায়গায় থাকছে খবর পেয়ে তার ভাই একবার কাছাকাছি আসার চেষ্টা করেছিল; কিন্তু, নিমি তাকে প্রশ্রয় তো দেয়ইনি উল্টে সিকিউরিটিকে দিয়ে রীতিমতো গলাধাক্কা খাইয়েছে। ফলে, সে নিমির জীবনে দাঁত ফোটাতে ব্যর্থ হয়েছে। নিজের কাজ, সুন্দর জীবন নিয়ে বেশ আনন্দেই কাটাচ্ছিল নিমি। বিদেশী টুরিস্টদের সাথে বেশ হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে নিমির। এক আধবার সেও নিজের উদ্যাগেই বিদেশ ঘুরে এসেছে; সংগ্রহ করেছে নানান তথ্য, যা তার কাজের ক্ষেত্রে পালক যোগ করার সাফল্য এনে দেয়।

সম্পূর্ণ অন্য জগতের মানুষ হয়ে ওঠে সেদিনের ছোট্ট নিমি। পাসপোর্ট বানাতে গিয়ে মনেপড়ে তার ভালো নাম ছিল নির্মলা। তাই, কাগজে কলমে সেই নামটাই ব্যবহার করে সে। ট্রাভেল এজেন্ট হিসেবে কাজকরতে করতে পরিচয় হয় ঝকঝকে স্মার্ট ড্যারেনের সাথে। বিদেশী টুরিস্ট হিসেবেই পরিচয়, কিন্তু প্রথমথেকে তার পার্সোনালিটি মুগ্ধ করতে থাকে নিমিকে। অনেকটা সময় নিমি শুধু ড্যারেনকে নিয়ে ঘোরে সেযা যা দেখতে চায় যেখানে খেতে চায় সব পুরন করে নিমি। দিনের শেষে অনুভব করে শুধুই একজন ক্লায়েন্ট নয়, ড্যারেন যেন আরোও ঘনিষ্ঠ কেউ নিমির জীবনে। যোগাযোগ থেকে যায়, মুগ্ধতা বাড়ে, ঘনিষ্ঠতাও। ড্যারেনের পরামর্শে নিমির জীবন আরোও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। ড্যারেনকে পার্টনার করে নিজস্ব ট্রাভেল এজেন্সি শুরু করে। কত মানুষকে কাজ দেয় সে, দেশে বিদেশে নিমির বাড়ী গাড়ী। স্বপ্ন ধরা বুঝি একেই বলে। বেশ কাটছিল নিমির দিনগুলো। মাসখানেক আগে তারা এবার বিয়ে করে থিতু হবার পরিকল্পনা করে নেয়। সেই মত সব এগোচ্ছিলও।

খুট করে দরজা খুলে অপরিচিত একটি ছেলে ঘরে ঢোকে। সোজা হয়ে শক্ত হয়ে বসে নিমি। তাকে অবাককরে দিয়ে
"দিদি, তুমি জেগে গেছ? ভালো হয়েছে। কিছু খাবে এখন? আমি বসকে ফোন লাগাচ্ছি, বস বলে গেছে তুমি জাগলেই খবর করতে"
"এই শোনো, কে তোমরা? আমায় এভাবে ধরে এনেছ কেন? কী চাও তোমরা? আমি তো তোমাদের চিনিইনা"
"দিদি, মিছামিছিই ভয় খাচ্ছেন। হ্যাঁ বস, দিদি জেগে গেছে, কত কিছু জিজ্ঞেস করতে লেগেছে। আচ্ছা, ঠিক আছে" বলে ফোন রেখে আর কিচ্ছুটি না বলে বের হয়ে গেলো ঘর থেকে। আজব মুস্কিলে পড়ল তো নিমি। একটু হাঁটা হাঁটি করে হাত পা ছুঁড়ে শরীরের রক্ত সঞ্চালন ঠিক করল নিমি। ঘরের লাগোয়া একটা বাথরুম পেয়ে ফ্রেশ হয়ে আবার ঘরে এসে বসে। নিজের হ্যান্ডব্যাগটাও খুঁজে পায়। সব অক্ষত থাকলেও ফোনটা গায়েব। মনে করার চেষ্টা করে নিমি শেষ কী হয়েছিল।

সেদিন ড্যারেনের কি একটা জরুরী কাজ এসে পড়ায় নিমির সাথে বিয়ের কেনাকাটি করতে যেতে পারেনি। একাই বেরিয়েছিল নিমি। তাদের অতি পরিচিত কফি শপে ঢুকে একা একাই কফি নিয়ে বসেছিল। কয়েক বছরের মধ্যে তার জীবন, অভ্যেস সব কেমন বদলে গেছে তাই নিয়ে চিন্তা করছিল।একটা সময়ে সে একা একাই ঘুরত, শপিং করত, কফি খেত, জীবন উপভোগ করত। কিন্তু আজ যেন ড্যারেনকে ছাড়া তার প্রিয় কফিও বিস্বাদ। কফি শপ ফাঁকা। কিছুই ভালো লাগছিল না বলে তাড়াতাড়ি বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। গাড়ী অবধি পৌঁছনোর আগেই চোখে অন্ধকার দেখে মাথা ঘুরে পড়েগেছিল, ব্যস্, আর কিছু মনে নেই তার পরের। আচ্ছা, ড্যারেন তার আগের রাতে কী একটা গেম খেলছিল? সই করা খেলা। দশটা সই করতে হবে, সবগুলো একই রকম হতে হবে যার যত বেশী সংখ্যকসই একই রকম হবে, সে জিতবে। নাহ্, আবার সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে তার। এবারে ঘরের বাইরে কথার আওয়াজ, কিছু গোঙ্গানির আওয়াজ পায় নিমি। দমবন্ধ করে শক্ত হয়ে বসে, লুকিয়ে পড়বে? কিন্তুকোথায় লুকোবে? তাছাড়া লুকিয়ে পড়লে তো কিছুই উদ্ধার হবে না।

দরজাটা বেশ জোরে খুলে এক দঙ্গল মানুষ ঢোকে ঘরে। একজনকে মুখে কাপড় দিয়ে বেঁধেও এনেছে তারা। দলের বসকে দেখে চমকে উঠে দাঁড়ায় নিমি।
"ভাই?"
"বোস দিদি, বোস বোস। ভয় নেই, তোর কোনো ক্ষতি করব না। এই মালটাকে চিনিস?"
"নাহ্"
"ভালো করে দেখ, দেখে নিয়ে বল"
"এ তো ওই কফি শপে..."
"হ্যাঁ একদম ঠিক ধরেছিস"
"ওকে ধরেছিস কেন? তুই আমাকেই বা ধরে এনেছিস কেন?"
"সব উত্তর পাবি। ড্যারেনটা কে?"
"মানে? ড্যারেন কে জেনে তুই কী করবি?"
"যা প্রশ্ন করছি সোজা সোজা উত্তর দে বলছি"
"ড্যারেন আমার ফিয়োঁন্সে মানে আমার হবু বর"
"জানি জানি, অত বাংলা করে বলতে হবে না। ড্যারেনকে ঠিক কতটা চিনিস তুই?"
"যতটা চিনলে একটা মানুষকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়"
"এই মেয়েটা ড্যারেনের বউ সেটা জানিস?"
"তোর কথা আমি মানব কেন?"
"আমি জানতাম তুই মানবি না, এই এটাকে সরিয়ে নিয়ে যা আর আমি দিদির সাথে কথা বলব এখনতোরা সব সরে যা"
"দেখ দিদি, তুই অনেক মাল কামিয়েছিস, নাম কামিয়েছিস, আমায় দেখতে পারিস না সব ঠিক। তবু, নিজের মায়ের পেটের বোন; এক কালে কতো যত্ন করেছিস, সেসব ভুলি কী করে? তোর সঙ্গে যোগাযোগনা থাকলেও তোকে খুন করতে পারলাম না। হ্যাঁ, আমি সুপারি কিলার। সুপারি কিলার বুঝিস তো? পয়সা নিয়ে লোককে টপকাই। কত ছেলেমেয়ে কাজ করে আমার আন্ডারে, কত সংসার চলে ওসব তুই বা তোদের মত ভদ্দরলোকেরা বুঝবে না। যাইহোক, এই ড্যারেন আর তার বউ মিশেল এ মাল দুটোর কাজই এটা। অনেক মুরগী কেটেছে এর আগে। এবার তোর পালা ছিল। মুস্কিল হয়ে গেল, তোকে মারারসুপারিটা আমায় দিয়ে। আমার দলের লোকের কথা মতো ওই ড্যারেনের বউটা তোর কফিতে কিছুমিশিয়ে দেয় যাতে তুই অজ্ঞান হয়ে যাস আর আমার ছেলেমেয়েগুলো তোকে তুলে আনতে পারে। রাস্তারলোকে ভাববে এরা তোকে চেনে, তোকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে, কাজেই কেউ আর মাথা ঘামাবে না। সবই ঠিক মত এগোচ্ছিল। এসব ছোটখাট কাজ আজকাল ওরাই করে। পরে তোকে সমুদ্রে ফেলে দিত, ব্যস্ খেল খতম। কিন্তু এই অপারেশনটায় যারা গেছিল, লাকিলি তারা কেউ কেউ তোর কথা জানত। মানে, আমার একটা দিদি আছে আর তার ছবি আমার কাছে দেখেছে। তোকে তুলে আনার সময়ে ওরা তোকে চিনতে পেরে আমায় খবর দেয়। আর তাই তুই এখনও ওয়ানপিসে রয়েছিস। ডোজটা বোধহয় তোর একটু বেশীই হয়ে গেছিল। এই ক'দিন তাই আমাকেই তোর দেখভাল করতে হয়েছে।

এবারে, দেখ, আমি বেইমানি করি না। ড্যারেনদের থেকে টাকা নিয়েছি কাজেই ওদের কাজ না করে টাকাটা রাখতে পারব না। আবার যাকে মারতে ওরা টাকা দিয়েছে তাকে

মারতেও পারছি না। এখন পুরোটাই তোর হাতে, তুই যদি ডবল পেমেন্ট করিস তাহলে তোর কথা অনুযায়ী কাজ করব। নাহলে..."
নির্বাক নিমি ভাবতে থাকে এখান থেকে বের হবার উপায় নেই, পুলিশে খবর দেবারও রাস্তা নেই।

কাকে সে শাস্তি দেবে? ড্যারেন? তার স্ত্রী? যারা তাকে মেরে তার সম্পত্তি নিয়ে নিতে চেয়েছিল নাকি তারসুপারি কিলার ভাইকে? যে পয়সার বদলে মানুষ খুন করে এবং অনায়াসে তা স্বীকারও করছে? নাকি জেনে শুনে নিজেকেই সঁপে দেবে সুপারি কিলার ভাইএর হাতে? সব থেকে সহজ বোধহয় সেটাই। তারপর তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি কামড়াকামড়ি করবে তার বিপুল সম্পত্তি নিয়ে।

কিন্তু এতদিন এত কষ্ট করে নিমি এই পরিমান সাফল্যের চূড়ায় উঠেছে, আজ এইভাবে হেরে যাওয়ার জন্যতো নয়। একটা শেষ চেষ্টা তাকে করতেই হবে। তার ভাই পাঁচ মিনিট সময় দিয়েছে তাকে, কিছু খাবারও দিয়েছে। খেতে খেতে ছক কষে নেয় নিমি। প্রথমে ফোনটা ফেরত পেতে হবে, তারপর এখান থেকে বেরোতেহবে। পুলিশে খবর দিতে গেলে ভাই ঠিক ধরে ফেলবে। অতএব পড়াশোনা না জানা ভাইকে অন্য পথে শায়েস্তা করতে হবে। বিদেশী সাংবাদিক বন্ধুদের খবর দিতে হবে, তারাই ঠিক পুলিশে খবর দিয়ে ড্যারেন, তার স্ত্রী আর নিমির ভাই সবাইকেই ধরার ব্যবস্থা করে ফেলবে। অতএব টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভাইকে ভুলিয়ে তার কাছ থেকে ফোন পুনরুদ্ধার করে নিমি। ভাইকে বোঝায়, তার ঘরে ফিরে ল্যাপটপ থেকে ব্যাঙ্কের কাজ করতে হবে তাকে। তাছাড়া এত বিশাল অঙ্কের টাকা তো বললেই দিয়ে দেওয়া যায়না। সেটা জোগাড় করতে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করতেই হবে। 'তোমার এবং তোমার বন্ধুদেরকাছে কিছু বিশেষ সহযোগীতা চাই; সাক্ষাতে বলা বাঞ্ছনীয়।' এই মেসেজ ভাইএর সামনেই বিভিন্ন ভাষায়লিখে পাঠায় নিমি তার বন্ধুদের। এবং কিছু কোড ল্যাঙ্গোয়েজ যা তারা ব্যবহার করত চূড়ান্ত বিপদের সময়ে। ভাই তার দলের কিছু লোক দিয়ে নিমিকে তার বাড়ীতে যেতে দেয়। নিমি বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনাদেবার আগে ভাইকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেয় ড্যারেন বর্তমানে কোথায় থাকতে পারে। ভাইএর পাঠানোবিশেষ পাহারায় নিজের বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হয় নির্মলা। অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে তাকে এমন নজরবন্দী অবস্থায়। সময়টা কাজে লাগাতেই হবে বোঝে নির্মলা। তার বন্ধুদের কাছে কোড ল্যাঙ্গোয়েজে ড্যারেন কোথায় থাকতে পারে সেই জায়গার হদিশও চলে যায় নিমির ফোন থেকে।

হাসপাতালের বেডে আজ একা নির্মলা। নাহ্ তার কোথাও কোনো অপরাধ বোধ নেই। নিমি বাকিদেরসাথে তার সুপারি কিলার ভাইও চরম শাস্তি পাক সেটাই চেয়েছে। হ্যাঁ, মনে মনে কষ্ট হলেও সে জানে এইসব অমানুষদের ক্ষমা করলে ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করবেন না। তাই, নিমি যখন বাড়ীর পথে যাচ্ছিল, তার ফোন থেকে অনবরত মেসেজ চলে যাচ্ছিল তার বন্ধুদের কাছে। নিমির মেসেজ এবং কোডল্যাঙ্গোয়েজ বোঝার মত বুদ্ধি বিদ্যা তার ভাইএরই ছিল না; তার সাকরেদদের তো আরোওই ছিল না। তাই নিমি তাদের সামনেই বন্ধুদের কাছে তাকে বাঁচানোর আবেদন জানায়। সে কোন পথে যাচ্ছে সেই লোকেশনগুলো সে জানাতে থাকে তার বন্ধুদের। মাঝপথে হঠাৎ পুলিশের উদয় হতেই

নিমিকে যারা নিয়ে যাচ্ছিল, তারা আন্দাজ করে ফেলে কী ঘটতে চলেছে। গোলাগুলি বিনিময় শুরু হয় পুলিশের সঙ্গে। হঠাৎই কাঁধের কাছে প্রচন্ড ঝাঁকুনি একটা দম আটকে আসা গরম অনুভূতি, ব্যস তারপর আর মনে নেই তার। কেমন করে হাসপাতাল পৌঁছল বা পুলিশ দুষ্কৃতিদের ধরতে পারল কি না, কিচ্ছু মনে নেই।

একটা মেসেজ আসার আওয়াজ পেয়ে নিমি ফোনটা কাছে টেনে নেয়। হাসি ফোটে তার মুখে। শেষ অবধি তাহলে জয় হলো নিমির প্রখর বুদ্ধিরই। নিমির ভাই, ড্যারেনের স্ত্রী এমনকি ড্যারেনও শেষ পর্যন্ত পুলিশের জালে আটকে পড়েছে। বন্ধুরা তৎপরতার সাথে পুলিশকে খবর করে একদিকে যেমন নিমিকে উদ্ধার করে অন্য দিকে নিমির ভাই সহ ধরে ফেলে সবাইকে প্রায় অনায়াসেই। নিমির ফোনের মেসেজবক্স ভরে আছে তার সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা বন্ধুদের। কিছু স্বার্থলোভী মানুষকে নিমি 'আপনারজন' বলে ভাবছিল। কিন্তু বর্তমানে সারা পৃথিবীতে তার আপনার জন ছড়িয়ে রয়েছে। যারা নিমির সুস্থহওয়ার অপেক্ষায়। শুনতে চায় নিমির সাহসীকতার গল্প। খবরের কাগজের পাতায় মেলে ধরতে চায় সে ঘটনা, পাঠকদের উদ্দেশ্যে।

সুখ নেইকো মনে

লক্ষী বন্দ্যোপাধ্যায়

খাঁচার দুয়ার খুলে
অন্য কোনো অরণ্যের বসন্ত বনে
সুখ নেইকো মনে
হায়, তারে কি হারিয়ে এলেম
হলুদ বনে বনে?

হে হৃদয়, নশ্বর নিখিল নীলে
খোঁজো অন্য কিছু, অন্য কোনও দান
যাও এইবার দূরে দিকশূন্য দিগন্তের
সমীপ সীমায়
পিপাসার স্নিগ্ধ ধারাজল করো পান!!

এখন যোজন সুখের সায়রে
দুঃখ সেঁচে যাওয়া
অরণ্যের বিকীর্ণ বসন্ত বনে
সুখকে খুঁজে পাওয়া।

তুই কি আমার সুখের সীমা
চোখের রঙিন নেশা
তোর সুখেতেই সোহাগ জ্বলে
বকুল গন্ধ মেশা।

সুখ কি ঘরের শীতলপাটি
সাঁঝ সকালের আলো
সুখ বুঝি তোর পোষা পাখি
হৃদয় চলকানো?

সুখ নেইকো মনে
হায়, তারে কি হারিয়ে এলেম
হলুদ বনে বনে?

The Blooming Paintbrush Studio

By Mithu Deb

- Instructor Mithu Deb is a retired art teacher at RRISD schools
- Texas board certified art educator
- Year-long Art and Clay classes
- Small classes
- Summer Camps for art and clay
- Youngest student has to be at least 5 years old
- Adults welcome
- No experience necessary
- Northwest Austin location off of 2222
- All supplies included

Website: www.bloomingpaintbrush.com

Contact: Mithu Deb

E-mail: mithudeb78759@gmail.com

Phone: 512-998-5052 (cell)

কিছু মিষ্টি কথা

মালবিকা বাসু

বাঙালীদের জীবনে একদিকে যেমন বাংলা গান, বাংলা সাহিত্যচর্চা, বাংলা কবিতাচর্চা রয়েছে, অন্যদিকে তেমনই উৎসব-পার্বণও আছে। আর উৎসব-পার্বণ মানেই তো জমিয়ে খাওয়াদাওয়া, তার সঙ্গে রয়েছে নানারকমের মিষ্টি। এই "মিষ্টি" শব্দটা শুনতেও যেমন মিষ্টি, খেতেও তেমন মিষ্টি । ফেলু মিত্তির মিষ্টি সম্পর্কে বলেছিলেন ওতে glucose আছে, glucose এনার্জি দেবে। বাংলা সাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুকুমার রায়, শিবরাম চক্রবর্তী তাঁদের লেখার মধ্যে বারে বারে এই এনার্জিকে ফিরিয়ে এনেছেন। মিষ্টি হল খাবারের দুনিয়ায় অমিতাভ বচ্চন। Absolutely overrated.... কয়েকজন ভালো বলছে, তাই সবাই ভালো বলছে। এগুলো আমার কথা নয়। এক সাংবাদিকের লেখা।

কথায় বলে, বাঙালীর বারো মাসে তেরো পার্বণ। এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। বাংলা নববর্ষ দিয়ে উৎসবের সূচনা হয়, তারপর চলতেই থাকে। সারা বছর আমরা কোনো না কোনো উৎসব-পার্বণে মেতে থাকতে ভালোবাসি। বাঙালীদের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজা এলে তো আর কথাই নেই। আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন পূজোর চারদিন উৎসবের আনন্দে মেতে থাকতাম । কিন্তু ইদানীংকালে পুজোর সাতদিন আগে থেকে উৎসব শুরু হয়ে যায়। আর উৎসব মানেই তো এলাহী খাওয়াদাওয়া, আর শেষপাতে মিষ্টি। মিষ্টি ছাড়া কোনো ভোজনই সম্পূর্ণ হয় না। আমরা বাঙালীরা যেমন ভোজনরসিক তেমনই মিষ্টিপ্রেমীও বটে।

গত বছর ২০২২ সালে দুর্গাপূজার সময় কলকাতাতে ছিলাম। তখনি দেখলাম, পূজো উপলক্ষে মিষ্টির দোকানগুলোতে ট্র্যাডিশনাল মিষ্টি ছাড়াও বিভিন্ন ধরণের রংবেরঙের মিষ্টি সাজানো রয়েছে। যেগুলোকে এখন fusion মিষ্টি বলা হয়। যেমন ম্যাংগো সুফলে সন্দেশ, মিহিদানা টার্ট, butterscotch জলভরা, আরও কত কি! আজকাল মিষ্টি ব্যবসায়ীরা রোজই নতুন নতুন আবিস্কার করে চলেছেন। সত্যি কথা বলতে কি, এই রংবেরঙের মিষ্টির সম্ভার এতো বেড়ে গেছে যে সাদা সন্দেশ অনেক কষ্ট করে খুঁজতে হয়।

দূর্গাপূজার সময় অনেক বনেদীবাড়ীতে পূজোর চারদিন মা দূর্গাকে খিচুড়ি, নিরামিষ তরকারি, পায়েস ইত্যাদি ভোগ দেওয়া হয়। আবার কিছু বাড়িতে মাকে নানারকমের মিষ্টি আর নোনতা ভোগ দেওয়ার রীতি আছে। গতবছর এইরকমই এক বনেদিবাড়ী হাটখোলা দত্তবাড়িতে (আমার মামাশ্বশুরবাড়ী) পূজো দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেখানে খিচুড়িভোগ নয়, পুজোর চারদিন নৈবেদ্যর থালাতে খাজা, গজা, বালুসাই, পান্তুয়া, দরবেশ সব মিলিয়ে ৮-১০ রকমের ভাজা মিষ্টি আর নোনতা ভোগ দেবার প্রথা ৩০০ বছর ধরে চলে আসছে। এই প্রসঙ্গে পুরোনো কলকাতার দুর্গাপূজো নিয়ে একটা বিখ্যাত উক্তি মনে পড়ে গেল। সেকালে কলকাতায় মা দূর্গা এসে গয়না পরতেন

জোড়াসাঁকোর শিবকৃষ্ণ দাঁয়ের বাড়ী, ভোজন করতেন কুমোরটুলির অভয়চরণ মিত্রের বাড়ী ।স্বভাবতঃই কৌতূহল হয় অভয়চরণ মিত্রবাড়ীর মিষ্টির ব্যবস্থা নিয়ে। শোনা যায়, তাঁর বাড়ীতে পূজোর সময় এক একখানা জিলিপির সাইজ নাকি একটা গরুর গাড়ীর চাকার মতো। এক একটা মিঠাইর আকার ছিল কাশীর কলসির মতো । দালানে যে দুটি থালাতে মিষ্টির নৈবেদ্য সাজানো হতো, তাতে মেঝে থেকে একেবারে কড়িকাঠে গিয়ে ঠেকতো মিষ্টির পাহাড়। এখন বোঝা যাচ্ছে, কেন মা দূর্গা অভয়চরণ মিত্রর বাড়ী ভোজন করতে যেতেন।

পুরোনো দিনের সাবেকী মিষ্টি সন্দেশ, রসগোল্লা সবই উত্তর কলকাতার কয়েকটি বিখ্যাত মিষ্টির দোকানে পাওয়া যায়। সেইসব মিষ্টির স্বাদই আলাদা। শুধু তাই নয়, ওই মিষ্টি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অনেক ইতিহাস জড়িয়ে আছে। আমরা অনেকেই জানি, ভোলা ময়রার নাতজামাই নবীনচন্দ্র দাস ছিলেন রসগোল্লার আবিষ্কারক। তাঁকে বলা হয় "রসগোল্লার কলম্বাস"। "আমি ভোলা ময়রা, হরুর চেলা, বাগবাজারে রই.....।" এইভাবেই নিজের পালাগানে নিজের পরিচয় দিয়েছেন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিয়াল ভোলা ময়রা। তিনি রস পরিবেশন করেছিলেন তাঁর কবিগানে আর তাঁর নাতি নবীন ময়রা শুকনো ছানার গোলকে রসে ফেলে তৈরি করেছিলেন বাঙালীর চিরকালীন রসগোল্লা। কাশীমিত্র ঘাটের কাছে এক চিনিব্যবসায়ীর পরিবারে তাঁর জন্ম। তিনি যখন মায়ের পেটে তখন তাঁর বাবা মারা যান। ছোট্ট বয়সে নবীন বুঝতে পেরেছিলো যে পরিবারে তাঁরা অবাঞ্চিত । অনেক বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে যখন চিৎপুরে নিজের মিষ্টির দোকান খুলেছেন তখন মা প্রায় নিঃস্ব। চলে গিয়েছে সব গয়না। নিজের দোকানে পরীক্ষা নিরীক্ষায় আবিষ্কার করে ফেলেছেন কড়া ও নরমপাকের মাঝামাঝি কস্তুরীপাক। তখনও রসগোল্লা তৈরী হয় নি। অবশেষে যেদিন হলো সে তো ইতিহাস হয়ে গেল। এই রসগোল্লা তৈরী করতে তিনি বারবার অসফল হয়েছিলেন। তাঁর আবিষ্কার "আবার খাবো" সন্দেশ, বৈকুন্ঠ ভোগ খুব বিখ্যাত।
সন্দেশের গল্প হলেই উত্তর কলকাতার নকুড়ের কড়াপাকের তালশাঁসের নাম বলতেই হয়। আজকাল কলকাতার সব দোকানে কড়াপাকের সন্দেশ পাওয়াও যায় না। চন্দননগরের জলভরা তালশাঁসের সন্দেশ খুব বিখ্যাত। এখানে একটা মজার গল্প আছে। দেড়শো বছর আগের কথা। হুগলীর তেলিনীপাড়ার বাঁড়ুজ্যে ঘরের জমিদারগিন্নীর সখ হোল যে তিনি নতুন জামাইকে একেবারে চমকে দেবেন। জামাইয়ের জন্য তালশাঁসের আদলে কড়াপাকের মিষ্টি তৈরী করতে হবে। তার ভেতরে থাকবে গোলাপজল। তাঁর এই আবদার রাখলেন চন্দননগরের সূর্যমোদক আর তাঁর ছেলে সিদ্ধেশ্বর। এরপর জামাই যেইমাত্র সন্দেশে এক কামড় দিয়েছে, ব্যস, গরদের পাঞ্জাবি ভিজে একাকার। সেই দেখে শ্বাশুড়ীমার হাসি আর ধরে না। তিনি যে কত রসিক ছিলেন বোঝাই যাচ্ছে। পুরোনোদিনে এরকম জামাই ঠকানোর অনেক গল্প আছে। শ্যালিকারাও নানারকম নকল মিষ্টি তৈরী করে নাকি জামাইদের খাওয়ানোর চেষ্টা করতো। তখনকার দিনের জামাইরা কি সত্যি এতো বোকা ছিল?

ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, রাণাঘাটের পান্তুয়া খুব বিখ্যাত। শোনা যায়, নোয়াখালিতে তখন দাঙ্গা চলছে। ট্রেনে করে সেই পথে যাচ্ছিলেন গান্ধীজি। পথে রাণাঘাট। অনেক কাজ। তবুও ওখানে হরিদাস পালের পান্তুয়ার স্বাদ থেকে সে

যাত্রাতেও তিনি বঞ্চিত হন নি। আবার এলাহী ভোজনের পর যুবক রবীন্দ্রনাথকে পান্তুয়া দিয়েই আপ্যায়ণ সেরেছিলেন কবি নবীন সেন। আমার যদিও পান্তুয়ার থেকে লেডিকেনির স্বাদটা বেশি ভালো লাগে। লেডিকেনির রঙটা হালকা ব্রাউন হয়। লেডিকেনির ব্যাপারেও একটা ইতিহাস আছে। তৎকালীন গভর্নর জেনারেল চার্লস ক্যানিঙের স্ত্রী লেডি ক্যানিঙের নামেই এই মিষ্টির নামকরণ হয়। ছোটবেলায় বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠানে ভিয়েনঘরে এই লেডিকেনি চোখের সামনে তৈরি হতে দেখেছি। সে সব মিষ্টির গন্ধ, স্বাদ আলাদা।

শুধু দুর্গাপুজোয় নয় , কালীপুজো, ভাইফোঁটা, বিবাহ, অন্নপ্রাশন যে কোনো উৎসব-অনুষ্ঠানে আজকাল ছানার মিষ্টি ছাড়াও অবাঙালীদের মিষ্টির দোকানেও ক্রেতাদের ভিড় উপচে পড়ে। প্রায় ১৪০ বছর আগে বারাণসী থেকে কলকাতা শহরে এসেছিলেন এক চৌরাশিয়া পদবীধারী মিঠাই নির্মাতা। বাঙালী বনেদীবাড়ীতে মিষ্টি খাইয়ে এমন মন মজিয়েছিলেন যে 'বাবু' খুশী হয়ে দোকান করার জন্য মানিকতলায় এক টুকরো জমিই দিয়ে দিলেন। গাঙ্গুরামের দোকান তাঁরই নির্মিত। সেখানকার মিষ্টি দই, শোনপাপড়ি, মতিচুর লাড্ডু অতি সুস্বাদু। উৎসবের দিনগুলোতে বলরাম মল্লিকের বেকড মিহিদানা, বেকড রসগোল্লা কেনার জন্য প্রচুর ভিড় হয়। দোকানের ভেতরে দাঁড়াবার জায়গা থাকে না। এইভাবেই শুধু রসগোল্লা, সন্দেশ নয়, বিভিন্ন ধরণের মিঠাইশৈলীকে বাঙালি আপন করে নিয়েছে ।

এত মিষ্টি কথার মধ্যে আমার প্রিয় রাবড়ির নাম তো করতেই হয়। কলকাতায় গেলে রাবড়ি খাবো না এতো ভাবাই যায় না। Indian Staistical Institute এর গোড়ার ইতিহাসের সঙ্গেও রাবড়ির যোগ আছে। তখন দেশ বিদেশের জ্ঞানীগুণীদের সেখানে আসাযাওয়া চলতো। তাঁদের মেজাজ সামলাতে সকলে তটস্থ। প্রশান্তচন্দ্র মহালনবিশ তখনি রাবড়ির মহিমা উপলব্ধি করেন। তাঁর কথায়, রাশভারী বিদগ্ধজনকে সবসময় রাবড়ির ট্রিটমেন্টে রাখতে হবে। বাঙালীর মিষ্টি কথার আর এক বাদশা হলেন শিবরাম চক্রবর্তী। কিশোর শিবরাম তখন শ্যামবাজার, হেদুয়া, বৌবাজার সব ঘুরে কাগজ ফিরি করে। দিনের শেষে কমিশনটা খরচ হয়ে যেত খাবারদাবার, সিনেমা এবং অবশ্যই রাবড়ি কিনে। তিনি তাঁর রাবড়িচূর্ণ বানানোর কৌশলটা বলেন। সের পাঁচেক রাবড়ি ভালো করে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। পরে শুকনো রাবড়ি গুঁড়ো করে বোতলে ভরে রাখতে হবে। তাঁর সিদ্ধান্ত এটাই - নেশা করলে রাবড়ির নেশা করাই ভালো। এরকম নেশা করতে আমারও কোনো আপত্তি নেই ।

শিবরামের যেমন রাবড়িচূর্ণ, পরশুরামের তেমনি রসভাজার গল্প। "রাজভোগ" গল্পে ধর্মতলার এক হোটেলের ম্যানেজার রাইচরণ চক্রবর্তী পাতিপুকুরের রাজা বাহাদুরের কাছে জানায় গোলাপি গাই বা গরুর দুধের সরভাজার কথা। তা নাকি নবাব সিরাজদৌল্লা খেতেন। রাইচরণ রেসিপিটা ভেঙে বলেন। একটি ভালো গরুকে সাতদিন ধরে গোলাপফুল, গোলাপজল আর মিছরি খাওয়াতে হবে। এমন গরুর গোলাপি দুধ থেকেই হয় এমন সরভাজা। রাইচরণের এই রেসিপি অনুকরণ করে কৃষ্ণনগরে সরভাজা, সরপুরিয়া হয় কিনা জানি না, তবে ওখানকার এইসব বিখ্যাত মিষ্টি যাঁরা খেয়েছেন তাঁরাই জানেন এগুলোর অপূর্ব স্বাদ।

রান্নার পদ যাই হোক না কেন, মিষ্টির বৈচিত্র্যে সকলকে পেছনে ফেলে দিয়েছে বাঙালী। ইতিহাস তার সাক্ষী। ঠাকুরবাড়ীর বিশিষ্ট রন্ধনপটীয়সী কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী প্রসঙ্গে হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন – "মিষ্টান্নের সুরস পাক তাঁহার হাতে উৎরাইতো চূড়ান্ত। তাঁহার হাতের চিঁড়ের পুলি, দইয়ের মালপোয়া, পাকা আমের মিঠাই একবার যে খাইয়াছেন, তাহার স্বাদ তিনি কখনো ভুলিতে পারেন নাই।" পুত্র রথীন্দ্রনাথও জানিয়েছেন, তাঁর মায়ের জালের আলমারীতে লোভনীয় মিষ্টি সর্বদাই মজুত থাকত। আর কবির ফরমায়েশ মত মৃণালিনীদেবীকে তৈরী করতে হত অভিনব সব মিষ্টান্ন। স্বামীজীর মেজভাই মহেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিকথাও সে সময়কার মিষ্টিবিলাসের সাক্ষী। ইতিহাস বলে, খাওয়ার শেষপাতে মিষ্টি দেবার প্রথা শুরু হয়েছিল সিপাহী যুদ্ধের আশপাশের সময় থেকে। তখন খাওয়ার পরে ভিয়েন থেকে সাজিয়ে আনা হত মাথাপিছু দুটো করে সরা। একটাতে থাকতো খাজা, গোজা, জিলিপি ইত্যাদি। অন্যটাতে ক্ষীরপুলি, সন্দেশ ইত্যাদি।

বাঙালীর বারো মাসে তেরো পার্বণের মধ্যে পৌষপার্বণ একটা বড় উৎসব। এই সময়ে নলেনগুড়ের পিঠে, পুলি, পায়েস না হলে আমাদের চলে না। শুধু গ্রামবাংলা নয়, আজকাল কলকাতা শহরেও পিঠেপুলির উৎসব খুব বড় করে পালন করা হয়। যারা সারা বছর মিষ্টি খায় না, তারাও এই শীতের সময় নতুনগুড়ের স্বাদে ভরা এই পিঠেপুলির উৎসবে মেতে ওঠে। পৌষপার্বণ শেষ হতে না হতেই মাঘমাসে সরস্বতীপুজোর তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। এইসময়ে খিচুড়িভোগের সঙ্গে নতুনগুড়ের নারকেলনাড়ু , সন্দেশ, পায়েস ভোজনরসিক বাঙালীর খুব প্রিয় খাদ্য। কথিত আছে, অধ্যাপক জয়গোপাল তর্করত্ন আয়োজিত সরস্বতীপূজোর সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন একটি শ্লোক – "লুচি কচুরি মতিচুর শোভিতং / জিলিপি সন্দেশ গজা বিরাজিতম।" ওনার গুরু সরস্বতীপূজোতে একটা শ্লোক লিখতে বলেছিলেন, তখনই তিনি এটি লেখেন। সরস্বতীপুজোর পরেই দোল উৎসব। দোল মানেই তো একমুঠো ফাগ আর রকমারী মিষ্টি। শৈশবের কথা মনে পড়ে যায় । দোলের দিন বড়োদের পায়ে আবির দিলে মিলতো ফুটকড়াই আর নানারঙের মঠ। জানি না, এখনকার প্রজন্ম এই ফুটকড়াই, মঠের স্বাদ কতটা পেয়েছে। তবে রং খেলে মিষ্টি খাবার প্রথা আজও আছে।

এ যুগে ভিয়েনের চল অনেক কমে গেছে। এখনকার বড় বড় মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা মিষ্টি তৈরির জন্য হাইটেক মেশিন ব্যবহার করছে। এতে সময় ও যেমন বাঁচে, পরিশ্রমও অনেক কম। যেমন, নুডলস তৈরির মেশিনে সীতাভোগ কিংবা জাপানী মোচি তৈরীর যন্ত্রে জলভরাসন্দেশ । এমনকি আজকাল রাবড়িও তৈরী হয় মেশিনে। বলরাম মল্লিকের দোকানে নলেনগুড়ের জলভরাসন্দেশ এই মোচির মেশিনেই তৈরী হয়। এছাড়া হার্ট শেপের চকোলেট সন্দেশ তৈরীর মেশিন, অটোমেটিক রসগোল্লা তৈরীর মেশিনও আজকাল ব্যবহৃত হচ্ছে। এই মিষ্টি যন্ত্রগুলোকে হাতিয়ার করে এগিয়ে চলেছে বাঙালী, অবাঙালী মিষ্টি ব্যবসায়ীরা। কিন্তু ছোটোখাটো ব্যবসায়ীরা আজও ভিয়েন ঘরেই মিষ্টি তৈরী করে। কারণ হয়তো অত দামী মেশিন তারা কিনতে পারে না, কিংবা পুরোনো দিনের ঐতিহ্যকে বজায় রাখতে চায়। তবে মিষ্টি হোক বা নোনতা হোক, মেশিনে তৈরী করুক বা মানুষ তৈরী করুক – স্বাদ ভালো না হলে সবটাই মাটি।

যতদিন বাঙালীজাতি থাকবে, ততদিন মিষ্টিশিল্পও থাকবে বলে আমার বিশ্বাস। সামনেই দুর্গাপূজো আসছে, এই সময়টা অন্ততঃ আমরা মিষ্টি খাওয়া থেকে বঞ্চিত থাকবো না। সবশেষে বলি, এতো মিষ্টি মিষ্টি কথা পড়বার পর কারোর যদি সুগার বেড়ে যায়, আমাকে দোষারোপ করবেন না যেন!

আরাধনা

বিমল সরকার

জান কি প্রিয় ভক্ত যারা
কিসের পূজা করি ?
কে প্রতিমা, কাহার পূজা
কেবা সে কৃষ্ণ হরি !
হাজারো মানব বলে গেলেন
যুগ থেকে যুগে ভাই
স্রষ্টা অসীম, অনন্ত সে
তাঁর তুলনা নাই ।
হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান
সিন্ধু আর্য যত
মানবের জ্ঞান সসীমে বন্দী
মনোভাবে হয় হত ।
মানচিত্র নয় ঠিকানা
কাগজ কালি পটে
গন্তব্য সে সহজ করে
প্রতিমাও সেই মতে ।
কোন প্রতিমা স্রষ্টা নহে
সসীম সে অঙ্কন
ভক্ত হৃদয় সাধনার ধাপে
নিবেদন করে মন ।

জ্ঞানীরা জানে,স্রষ্টা সে এক
নেইতো আকার তাঁর
সর্ব ভূতে ব্যাপ্তি তাঁহার
ব্রহ্ম, নিরাকার ।
যোগী ভাবে তো তার হৃদয়ে
পরমাত্মার বাস
যোগে যুক্ত দিবানিশি সে
জানতে তাঁরে আশ ।
ভক্ত বলে দেখিনি যাঁরে
কেমনে পূজিব তাঁরে
প্রতিমা পূজার হল প্রচলন
ভক্তের অধিকারে ।
জ্ঞানী তো বলেন ব্রহ্ম তাঁরে
পরমাত্মা , যোগী
ভক্তেরা তো বলে ভগবান
ভ্রমেতে অনেকে ভোগী ।
সাগর কি আর নিতে পার জীব !
সাগরে বিসর্জন !
ভাব বিভাবে স্রষ্টা সাগরে
বিশ্বের নিবেদন ।

বৈশাখী

মানস দে

নববর্ষ ১৪৩০

হা হা হি হি তো ছিলই ছিল হাহাকারও। কখনো একটা জলভরার জন্যে বা কখনো একটা এগ চিকেন রোলের জন্যে। বারোটা থেকে Pujari র বৈশাখী মেলা শুরু হবার কথা। আমি জাস্ট কুড়ি মিনিট পরে এসে সোজা লাইনে স্রেফ একটা জলভরার জন্যে। আমাকে "বাপি বাড়ি যা" বলার ভঙ্গিতে বলা হলো – জলভরা শেষ তবে জল আছে। কস্টকোর জল। গম্ভীরভাবে আমাকে বললেন আমার দিকে না তাকিয়েই। জলভরা মার্কা রোয়াব মাইরি! জলভরা না পেয়ে মোগলাইয়ের কুপন নিয়ে যখন মোগলাইয়ের খোঁজ করছি, যখন মোগলাই দেখতে না পেয়ে টেনশন করছি, আমাকে কে বললো মোগলাই আসছে। কোথা থেকে আসছে, কখন আসছে এসব জিজ্ঞেস করার আগে একজনের অর্ধেক খাওয়া রোলের ক্রস-সেকশনে চোখ চলে গেল। বাইরে তেলে ভাজা বাদামি পরোটার ওপর ওয়াক্স পেপার সযত্নে মোড়া। কি যত্ন করে পেপারটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। জিভের জলটা গিলে নিয়ে এক ঝলক তাকিয়ে ভিতরে কি কি আছে দেখার চেষ্টা করছি। পাশেই দেখলাম একজন মালপোয়ার শেষ অংশটা মুখে পুরে বাটিটা ফেলে আঙ্গুল চাটছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম – দাদা মৌরীর গন্ধ পেয়েছিলেন? উনি বললেন – একদম। এতো অপশনে আমি তখন কনফিউশানে ভুগছি।

কনফিউশানে ডিসিশন নিতে নেই। তাই একবার স্যাট করে অডিটোরিয়ামে ঢুকে গেলাম। ঢুকে দেখি "আগুনের পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে"। সারা স্টেজ জুড়ে সবাই গলা মেলাচ্ছে। আমিও গলা মেলালাম চেয়ার থেকে। সামনে দুজন নৃত্য পরিবেশন করছিলেন। যেন কেউ হিপনোটাইজ করে ফেলল কিছুক্ষণের জন্যে। Piyaর সেই অনুষ্ঠান শেষ হতেই আবার সংস্কৃতি থেকে খাবারে ফিরে গিয়ে দেখি রোল সোল্ড আউট! যাঃ! যাইহোক ততক্ষণে মোগলাই হাজির। মোগলাইয়ের ওপর পাতলা ফিনফিনে আস্তরণের অসামান্য ফিনিশিং। এই ফিনিশিং পেলাম চপেও। চপের খোলের মধ্যেই খেলা। পাতলা হলে মনে হবে কোথায় গেল আর মোটা হলে জিভে অস্বস্তি। একদম অপটিমাম। হটাৎ দেখি Rakhi কোথা থেকে একটা জলভরা এগিয়ে দিল। প্রিবুকিংয়ের মাল। সেজন্যেই জনতা লাইনে পাইনি। এটাতেও সেই অসামান্য ফিনিশিং। মুখে আলাদা করে দানা দানা লাগছে না। নতুন গুড়ের গন্ধ আর কামড়ের সঙ্গে মুখে খেলেই মিলিয়ে যাওয়া সব মিলিয়ে এক স্বর্গীয় অনুভূতি। পাটিসাপটাতেও সেই একই শিল্পের ছোঁয়া। নতুন গুড় আর খোয়ার মিশ্রণ দেওয়া পুর। তাছাড়াও কিমা ঘুগনি, নিরামিষ ঘুগনি, ভাজা পিঠে, কাবাব – সত্যি কথা বলতে কি টেস্ট করার আগেই উড়ে গেল ক্রিস গেলের মারা ছক্কার মতো। করিডোরে প্রচুর ভিড়। একবার টিকিটের লাইন দেখতে গেলাম। দেখলাম লাইনের বদলে দেশী জটলা। একজন অন্যজনের কাঁধের পেছনে মাথা রেখে হাতের ফাঁকে হাত গলিয়ে লেংচে বলছে চারটে পাটিসাপটা, দুটো ভাজা পিঠে, দুটো লবঙ্গ লতিকা। যিনি বলছেন সেই মহিলার বয়েস নাকি স্লোমোশানে বাড়ে। সেই ক্যালোরিনী বৌদির মিষ্টি মুখে আজ

মিষ্টি উঠছে। কি যে মিষ্টি লাগছিল! ধন্য নববর্ষ! সার্থক তুমি।

ওদিকে অডিটোরিয়ামে তখন একের পর এক প্রোগ্রাম হয়ে চলেছে। কখনো সেতার তো কখনো লোকসঙ্গীত মাঝখানে টুক করে একটু বলিউডি ফিউশনে নববর্ষে একটা নিউইয়ার টাইপ ইলিউশন তৈরী হয়েছিল। সেই ইলিউশন ভাঙালো ভাঙড়া নাচ। ততক্ষণে নববর্ষ বাঙালির থেকে সারা ভারতের হয়ে গেছে। বিভিন্ন প্রদেশের পোশাকের ফ্যাশন শো দেখে মনে হচ্ছিল "পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ।" এটাই আমার দেশ, এটাই ভারতবর্ষ। সেই লোকটা যিনি ভারতবর্ষের প্রকৃত ছবি এঁকেছিলেন স্বাধীনতার অনেক আগেই। অবশেষে তিনি এলেন। মালা পরানো হলো তাঁর ছবিতে। নৃত্য পরিবেশন করলো Sarbani। উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি শুনছিলাম Amartyaর। ভাবছিলাম যে দেশের ছবি তিনি এঁকেছিলেন তা আজ বিস্মৃত প্রায়। "তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি।"

হটাৎ দেখলাম Sushanta আর সুসেন কাঁচুমাচু মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জিজ্ঞেস করতে বলল প্রোগ্রাম বিফোর টাইম চলছে পরের টিম আসেনি। প্রথমবার পূজারীতে। বাঙালি বিফোর টাইমে দৌড়োচ্ছে। লোকজনকে সাধাসাধি কবিতা বা গান করার জন্যে। মানে ফিলার আর কি! আমাকে বলা হলো আমাদের নাটকটা যদি আরেকটু 'টানা' যায়। আমি বললাম – ইউটিউব ভিডিওর মতো প্লে স্পিড হাফ করতে পারি। সংলাপ তো বাড়ানো যাবে না। তবে তার জন্যে ডিরেক্টরের পারমিশন চাই। প্রোগ্রাম শুরুর আগে আমি আবার গম্ভীর মুখে সুসেনকে জিজ্ঞেস করলাম – "কোন স্পিডে করবো ডিরেক্টর কিছু বললো?" ও সিরিয়াস মুখে বললো – "না, নরমাল স্পিডেই করো। আমি লোক পেয়ে গেছি।" পিছিয়ে যাওয়া সময়ের হাত ধরার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল Debadrita ও সায়ক। না না, একটু ভুল বললাম কণ্ঠ বাড়িয়ে দিয়েছিল। ওদের গানটা ছিল উপরি পাওনা। এভাবেই ফিউশন থেকে ফ্যাশন, ম্যাজিক থেকে বাচিক, গান থেকে পালাগান সবই ছিল। অংশ নিয়েছিল আটলান্টার প্রায় সমস্ত বড়ো বাঙালি পরিবার – Bengali Association of Greater Atlanta , প্রবাসী, Purbasha। ছিলেন প্রচুর অবাঙালিও। আলাদা করে ফটোবুথ করা হয়েছিল। বিভিন্ন রকমের পোজের সঙ্গে ছিল কত রকমের হাসি। যে মুখে হাসি দেখি না সেই মুখও হাসছে। অনেকদিনের জমে থাকা হাসি ফ্রেমের মধ্যে খরচা করেছেন মানুষ অকাতরে।

প্রোগ্রামের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝেই বেরিয়ে আসছিলাম। দেখলাম দুঘন্টার কম সময়েই সব খাবার শেষ। প্রায় তিনটে নাগাদ এক দম্পতিকে দেখলাম। এসে দেখি করিডোরে একবার সামনে যাচ্ছেন আর পরমুহূর্তেই আবার ফিরে আসছেন। এমনি প্রায় বার তিন-চারেক করলেন। আমি ভাবলাম বোধহয় খাবার হজম করছেন। আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন – দাদা, খাবার কি শেষ? আমি বললাম – কি খাবার? উনি একটু ইতস্ততঃ করে বললেন ওই রোল, চপ, মিষ্টি। এতক্ষণ পর আমার কাছে পরিষ্কার হলো ব্যাপারটা, কেন দাদা আর বৌদি করিডোরে আপ ডাউন করছিলেন। আসলে গন্ধটা তখনও করিডোরে ছিল। তারসঙ্গে টেবিল ক্লথে লেগে থাকা ঘুগনি, চপের গুঁড়ো কিছুটা হলেও আশার সঞ্চার করেছিল তাঁদের মনে। আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে – "দাদা বিজয়া দশমীর পর অষ্টমীর অঞ্জলীর জন্যে এসেছেন?" কিন্তু চেপে গেলাম। রোল, মোগলাই,

মিষ্টি নিয়ে প্রবাসী দাদা-বৌদির সঙ্গে ইয়ার্কি করা উচিত নয়। আমি বললাম - "রোল খাবেন?" উনি উৎসাহে বললেন - হ্যাঁ। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ফুড ট্রাকটা দেখিয়ে বললাম - ওখানে চিকেন wrap পাবেন শুধু বলবেন পুদিনা না দিতে তাহলে খারাপ লাগবে না। উনি বললেন - না না বাঙালি রোল পাওয়া যাবে না? আমি বললাম - "কোন রোল? বাঙালি চিকেন হলে আবার পরের বছর আর বাংলা নাটকের রোল হলে পুজোর সময় পেয়ে যাবেন।" তারপর আর দাঁড়ানোর রিস্ক নিই নি।

এভাবেই শেষ হলো পূজারীর প্রথম বৈশাখী মেলা। সব ছিল তবুও ১৪৩০ যেন কিছুটা অন্তরালেই থেকে গেল ২০২৩ এর ছায়ায়। খানিক যেন বাঙালি ছাপোষা মানুষটার মতো। আছে কোথাও সে বেঁচে আমাদের মনের গভীরে। মাঝে মাঝেই সে জেগে ওঠে। জেগে ওঠে একাকীত্বে, জেগে ওঠে হারানোর বেদনায়, জেগে ওঠে নিশুতি রাতের স্বপ্নে, জেগে ওঠে জীবনের ছোট ছোট চাওয়া পাওয়ায়, দুঃখে বা আনন্দে অনেকটাই অজান্তে। পৃথিবীর সব বাঙালির সাথে আজ বাঙালি হওয়ার হীনমন্যতায় ভোগা বাঙালিরও নববর্ষ, বাংলা ভাষায় কথা বলতে লজ্জা পাওয়া বাঙালিরও নববর্ষ, বাংলা ভুলতে চাওয়া বাঙালিরও নববর্ষ। মনের গভীরে এনারাও আমাদের মতোই খাঁটি বাঙালি। তাই সব বাঙালিকে জানাই নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। চলুন সবাই মিলে ভালো থাকি ও একে অপরকে ভালো রাখি।

স্মৃতির হাত ধরে কিছুদূর

মনীষা সরকার

মেরিবেথএর সাথে আলাপ হলো ডাইনিং হলে, যখন জাপুকাই ভিলেজের কিন্দোরা ট্রাইবদের গ্রামে টুর সেরে ফিরলাম।
সময়টা ছিল ২০১৭ এর ডিসেম্বর মাস। অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড এ পোর্ট ডগলাস এর বিকেল পাঁচটা। পড়ন্ত রোদে ডেকে বসে কথা হচ্ছিলো আমাদের। আজকে এই টুরিস্ট গ্রুপের জন্য ট্রাভেল এজেন্সী দারুন একটা বুফে সার্ভ করলো। মাংস ছাড়াও নানারকমের মাছ , বিশেষত: চিংড়ি মাছের ছড়াছড়ি। পোর্ট ডগলাসএ সীফুড খুব ফেমাস।

এক একটি ডাইনিং টেবিলে ৬-৮ জন করে বসতে পারে। আমাদের টেবিলে অন্যান্য কয়েকজনের সাথে মেরিবেথ ও তার মেয়েও ছিল। প্রাথমিক আলাপের পর ক্রমশ: গল্প আরো জমে উঠেছিল যখন জানতে পারলাম যে মেরিবেথ টেক্সাস এর সান এন্টোনিও তে থাকতো। এবং এখনো সেখানে তার একটি ছোটোখাটো বাড়ি আছে। বছরে একবার অন্তত: সে আর তার মেয়ে গিয়ে বসবাস করে সেই বাড়িতে।
হ্যাঁ , ওর মেয়ে আনী দেখতে ভিয়েতনামিদের মতো দেখতে, বয়স ১৪, দোহারা মাঝারি সাইজ; গায়ের রং মাজা , মানে আমাদের মতো। মেরিবেথ বেশি লম্বা নয় , কিন্তু বিশুদ্ধ শ্বেতাঙ্গী মহিলা। বয়স হয়তো পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই। দেখে বোঝাই যায় যে অনিকে মেরিবেথ এডপ্ট করেছে।

আমাদের মতো মেরিবেথ ও তার মেয়ে হাত দিয়ে ধরে চিংড়ি মাছ খাচ্ছে খোসা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে। স্টিমড চিংড়ি মাছ মাথা শুদ্ধ অঢেল পরিমানে পরিবেশিত। এতো টাটকা বড়ো বড়ো চিংড়ি পোর্ট ডগলাসেরই বিশেষত্ব।
আমি সহাস্যে মেরিবেথ কে বললাম "I see that you guys like prawn as well".
মেরিবেথ সুমিষ্ট উত্তরে বলে "yes of course, we are very much used to eating fresh fish and sea foods. staying in Japan got us used to liking seafoods".
আমরা কৌতুহলিত ভাবে শুধোই। ....." so how long have you been in Japan ?"
....."Oh for last 16 years atleast".....বললো মেরিবেথ।

আমাদের এবং অন্যান্য টেবিলের অনেকেই খাওয়া শেষ করে হাটাহাটি করছে জলের কাছাকাছি বিচে। ক্যামেরায় তুলে ধরে রাখছে প্রকৃতির অপরূপ শোভা। এই বিচটাকে অনেকেই বলে থাকেন ফোরে মাইল বিচ.
তবে এইটা কিন্তু চার মাইল লম্বা নয় ; স্থানীয় লোকেরা বলে চার কিলোমিটার হতে পারে।

আমরা খাওয়ার মাঝেমাঝে নিজেদের গল্পের রেশ টেনে রেখেছি।
এরপর আমাদের যেতে হবে Aboriginal culture tour এ. উঠতে হবে Kuranda skyrail এ.

আমি ও আমার স্বামী , মেরিবেথ ও আনি এবার স্টিম ইঞ্জিনের পূরনো পন্থী ট্রেনে উঠলাম।
হালকা কথোপকথনের মাঝে মাঝে শুনছি PA তে টুর গাইডের বিবরণ। চারিদিকের ayborigin সভ্যতা ও তাদের স্থপতির কথা। ট্রেনে বসেও মেরিবেথের সাথে গল্প চলতে থাকলো। কয়েকদিনের মধ্যেই জেনেছিলাম মেরিবেথ ও আনির জীবন কাহিনী। আমার ভাষায় সিটিকে জানালাম এখানে।.....
প্রায় বছর কুড়ি আগে একবার মেরিবেথ টোকিও গেছিলো Peace Corp গ্রুপের সাথে। সেখানেই তার আলাপ হয় Japanese Major General Mr Hasegawa র সাথে।

মেরিবেথের বাবা ছিলেন San Antonio, Tx এর Army Hospital এর ডাক্তার। ছেলেবেলা থেকে তাই মেরিবেথ আর্মির আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছে আর শিখেছে তাদের জীবনের পদক্ষেপকে সম্মান জানাতে। Hasegawa র সাথে অনেক সময় কাটিয়ে সে বুঝতে পারলো যে দুজনের পরস্পরের প্রতি গভীর সম্মান ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ভালোবাসা ও প্রতিটি মুহূর্তের সান্নিধ্য তাদের জীবনে অপরিহার্য্য। ঘন ঘন আসাযাওয়া চলতে থাকলো San Antonio ও Tokyo . তাদের বন্ধুত্ব ধীরে ধীরে পরিণত হলো প্রেম ও বিবাহে। বিবাহের পরেই Hasegawa মেরিবেথ কে বলেছিলো যে টোকিও–র কয়েকটি Orphanage এর সঙ্গে সে যুক্ত আছে এবং তাদের যথাসম্ভব আর্থিক ও সামাজিক ভাবে সাহায্য করাই তার জীবনের মূল আনন্দ। মেরিবেথ ও সেই কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিলো। বিয়ের কয়েক বছর পার তারা বুঝতে পারলো যে মেরিবেথ নিজে কখনো সন্তান ধারণ করতে পারবেনা। তাতে করে দমে গেলোনা কিন্তু ওরা। বরং Hasegawa চাইলো একটি মেয়েকে Tokyo র Orphanage থেকে এডপ্ট করতে। মেরিবেথের সম্পূর্ণ সম্মতিতে দুজেন তাদের জীবনে adopt করলো এই আনিকে।

অতি আদরে আনি বড় হতে লাগলো ওদের সংসারে। কিন্তু আর্মি'র Demanding life style এ , Hasegawa র স্বাস্থ্য ধীরে ধীরে খারাপ হতে লাগলো। আকস্মিক ভাবে Hasegawa র ধরা পড়লো Lung Cancer . অতিরিক্ত ধূমপানের নিষ্ঠুর পরিণতি। আনি যখন মাত্র চার বছরের তখন বিপদের দুর্যোগ ঘনিয়ে নামলো তাদের সুখের সংসারে। নিষ্ঠুর নিয়তির হাতছানিতে সমস্ত চিকিৎসা শাস্ত্রকে ব্যার্থ করে চলে গেলো পৃথিবী ছেড়ে আনি ও মেরিবেথের সর্বপ্রিয় মানুষটি Mr Hasegawa . Medical Science যতই উন্নত হোক , নিয়তির হাতে মানুষের অসহায়তার সাক্ষ্য হয়ে রইলো Hasegawar র বিদায়। মাত্র ৪৫ বছর বয়েসে এক চার বছরের শিশুকে নিয়ে এক হয়ে গেল মেরিবেথ। আমেরিকাবাসি তার কিছু বন্ধু ও আত্মীয়রা তাকে উপদেশ দিয়েছিলো আমেরিকায় ফিরে আসতে , টোকিও সংসারের পাট তুলে দিয়ে। কিন্তু সেসব উপদেশকে উপেখ্যা করে , আনিকে নিয়ে মেরিবেথ শুরু করলো এক অন্য জীবন। টোকিওর প্রাইমারি স্কুলে সে English ও Math পড়াতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে চললো আনি র স্কুল। আর তার ফাঁকে ফাঁকে মেরিবেথ চালিয়ে যায় অনাথ আশ্রমে সাহায্যের কাজ , কখনো আর্থিক ভাবে , আবার কখনো তাদের পড়ানোর কাজে। আনিও পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে মাকে সাহায্য করে অনাথ আশ্রমের কাজে। এ কাজ মেরিবেথ করে যাবে আজীবন ; এ কাজ যে বড় প্রিয় ছিল Mr Hasegawa র। , তাই সে চালিয়ে যাবে এই সেবার কাজটুকু। ফি বছরের গরমকালে তিনমাস মেরিবেথ মেয়েকে নিয়ে থাকে San Antonio তে। বাকি

সময় টোকিওতে। মাঝে মাঝে এইভাবে মেয়েকে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে দেশ ভ্রমণে , যেমন এবার এসেছে অস্ট্রেলিয়ায়। মেরিবেথের মতে , সে তার জীবনযাত্রা দিয়ে অনিকে শিখিয়ে যাবে নিজেকে উৎসর্গ করে অন্যের জন্য বাঁচার আনন্দের পরিপূর্ণতা। আমরা হোটেলের ডেকে বসে সমুদ্র সৈকতের গোধূলিবেলায় মেরিবেথের জীবনের এই মধুর গল্পের শেষটুকু শুনলাম। পড়ন্ত রোডের সোনালী আভায় ভিজিয়ে দিয়েছে মেরিবেথের অশ্রুসিক্ত গালদুটি। কিছু বেপরোয়া হাওয়ায় উড়ে এলো কটা সাদা ফুলের পাপড়ি। কয়েকটি অজানা পাখি গেয়ে গেল কাছে কোথাও। আমরা ভাষাহীন। মনে মনে মেরিবেথকে প্রণাম না করে পারলাম না। প্রকাশ্যে তার হাতদুটি ধরে বললাম। ...Your sacrifice for Annie and for fulfilling your husband's wish is highly admirable. Our best wishes for your peace and all the happiness in life".....

হোটেলের ঘরে ফিরেও সেই হালকা বেদনামাখা এক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। ভাবছিলাম যতই হিংসা, দেশ, দ্বন্দ্ব নিয়ে দৈনিক খবরের আর্তনাদ চলুক , পৃথিবীতে এখনো কিছু নিঃস্বার্থ প্রেমের , অক্লান্ত ত্যাগের নজির রেখে চলেছে মেরিবেথের মতো লোকেরা।
মনে পড়ে গেলো এক মহাপুরুষের বলা এক গল্প কাহিনী। এক চড়ুই ও ঝড়ের গল্প।

এক জঙ্গলের একটি ডালে বসে আছে একটি ছোট্ট চড়ুই পাখি। হঠাৎ জঙ্গলে এলো এক প্রচন্ড ঝড়। বড় বড় গাছের ডালপালা সব ভেঙে পড়তে লাগলো। অন্য সব জীবজন্তু প্রাণ বাঁচাতে আশ্রয় খুঁজতে ব্যস্ত। ছোট্ট চড়ুইটির কি হলো ঝড়ে ? কিছুই হলোনা ; সে তার তার দুটি ডানার ওপর নির্ভর করে উড়ে চলে গেল কোনো এক নিরাপদ আশ্রয়ে। মহাপুরুষ বোঝালেন। ...." আমাদের দুটি ডানা হলো Faith আর Self Confidence. এই দুটি দানার ওপর নির্ভর করে আমরা জীবনের যে কোনো ঝড়ের মোকাবিলা করতে পারবো , পারতেই হবে।“ জানিনা সে রাতে স্বপ্নে না জাগরণে ভাবছিলাম সে স্বর্ণযুগ আসবে যখন আমাদের সন্তানসন্ততি ও তাদের উত্তরসুরিরা এই আনিদের হাত ধরে বলবে এই ছোট্ট চড়ুইয়ের গল্প ; বলবে ' হিংসা নয় , স্বার্থ নয় , ভাবো প্রেম; ভয় কি, আমরা তো আছি , একজোটে আমাদের সঙ্গে এস , চলো এগিয়ে চলি নির্ভয়ে হাত ধরাধরি করে’

সায়াহ্নে

পাপিয়া দাসগুপ্ত

আমরা ছেলেবেলাতে যখন হাঁটতে শিখি তখন প্রায়ই পড়ে যাই। বাবা, মা, বাড়ির বড়োরা আমাদের সামলে তুলে ফেলেন, চোখে চোখে রাখেন, এইভাবে আমরা আস্তে আস্তে চলতে শিখি, তারপরে তাড়াতাড়ি চলা, নিজেকে সামলে চলা , ক্রমশ আমাদের মধ্যে আসে গতি। আবার আমরা যখন বুড়ো হয়ে যাই তখন আমাদের সন্তানদের কাছে আমরা হয়ে উঠি সেই শিশু। কখনো এই বুড়ো হওয়া খুব তাড়াতাড়ি এসে দাঁড়ায়।

আমার মানসিক শৈশব এখন আমাকে তাড়না দিচ্ছে, আর আমার সোনা ছেলে আমাকে মহাসিন্ধুর ওপার থেকে সামলে রাখছে – পাছে আমি আরো ব্যাথা পাই।
ছোটবেলাতে একটা কথা বাড়িতে বড়দের কাছে শুনতাম – বুকটা ঝাঁজরা হয়ে গেছে – সে যেকোনো কারণে হোক। এখন কিন্তু এই কথাটা উপলব্ধি করি আর মনে হয়ে আমি সেসব বড়দের চিৎকার করে বলি, আমি জানি, আমি জানি এই শব্দের আসল মানে আমি জানি আর উপলব্ধিও করি।

একটা প্রচন্ড প্রচলিত কথা আছে – স্বপ্ন দেখা ভালো কারণ স্বপ্ন নাকি সত্যি সফলতার আর এক নাম। কে যে এইসব প্রচলন করেছে জানিনা, কিন্তু যদি নচিকেতার ভাষায় বলি ------ যখন সময় থমকে দাঁড়ায় , নিরাশার পাখি দুহাত বাড়াএ.....স্বপ্ন দেখে মন। মন আবার নির্জন কোন খুঁজে ভিতরের রক্ত ক্ষরণ চেপে ধরে এক নিরাশার রাজ্যে পাড়ি দেয়।

আমাদের দেশে সাধারণত বার্ধক্যে পৌঁছনো মানে সন্তানের জিম্মাতে থাকা। কিন্তু সেই বার্ধক্য যখন অসময়ের সঙ্গী, আর সন্তান মনের মনিকোঠায় স্থান নেয়, তখন কিন্তু আবার অন্য রকম অনুভূতি বার্ধক্য কে চালিত করে। সে নিজেই নিজের পথ নিজে খুঁজে নেয়। এ যেন ঠিক -- নিজেরে হারায়ে খোঁজা।

সে যে চলে গেল, বলে গেলোনা। শুধু রেখে গেল অগুনিত স্মৃতি, ভালোবাসা , হাসি মুখ, কথা আর কিছু গান। এ যেন উল্কা পতন। জানিনা এত তারার মাঝে কোন তারাটা আমার নয়ন তারা । যদি জানতাম, তবে তাকে আঁকড়ে ধরে রাখতাম। পৃথিবীর এমন কোনো শক্তি নেই যা আমার মানিককে ছিনিয়ে নিতে পারে।

এতো অল্প বয়সে সে প্রমান করে দিয়েছে যে সে আমাদের থেকে অনেক অনেক উর্ধে – দরদী মন , ভক্তি , শ্রদ্ধা , সম্মান – তাকে এক অন্য মাত্রার মানুষ করে তুলেছিল যা ওর বর্তমানে আমরা উপলব্ধি ও করতে পারিনি।

জীবনের চলার পথের গতি কখনো ছিন্নভিন্ন, আবার কখনো স্তব্ধতা আর নিরাশায় ভরা, মন উতলা। কেউ আর আমার হাতে একই থালায় খেতে চাইবেনা, নানা ধরণের

খাবারের আবদারও করবেনা, দিন গুনবেনা আবার কবে দেখা হবে। আমি যে চাই মানিক তোমাকে দেখতে আর বাকি দিনগুলো একসাথে কাটাতে। কিন্তু আমি তো জানি যে তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম, যা আমার একান্ত আপন। তারি মাঝখানে আমি খুঁজি আকাশ ভাড়া সূর্য তারা। তুমি ছিলে, তুমি আছো, তুমি থাকবে আমার শুধু আমারই হয়ে। তাই তো তোমাকে আমি আমার ব্যার্থতা আর বার্ধক্যের সাথী করে থাকতে চাই ইহকাল আর পরকালের মেলবন্ধনে।

ভালো থেকো, ভালোবাসা রইলো। .....

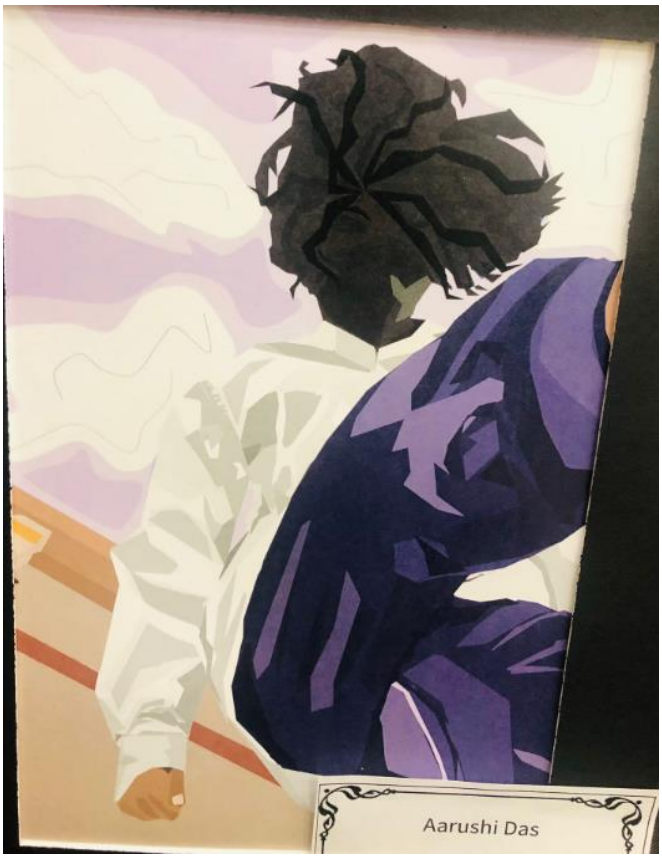

Jumping Girl
Aarushi Das (7th Grade)

Lost in tranquility
Sreeja Dutta

যক্ষ যুধিষ্ঠির কথোপকথন

পার্থ মুখার্জী

মনে পড়ে ছোটবেলায় ঠাম্মার হাত ধরে বাগবাজার ঘাটে যেতাম – ঠাম্মা গঙ্গাস্নান ও বারব্রত পালন করতেন। কাছেই বড় একটা বটগাছের ছায়ায় আসন পেতে বসে কথকঠাকুর পড়তেন আর সামনে অর্ধচন্দ্রাকারে অনেক লোক – অধিকাংশই মহিলা – বসে শুনতেন। সাত-আট বছর বয়সে, আর কিছুই মনে নেই; শুধু কথকঠাকুরের শুরু করার কথা ছাড়া। খুবই সুমধুর গলায় তিনি পাঠ আরম্ভ করতেন – "মহাভারতের কথা অমৃতসমান। কাশীরাম দাস কহে, শুনে পূণ্যবান।" সেই বয়সে মহাভারত, অমৃত, পূণ্য এইসব কথা একেবারেই অবান্তর বলে মনে হ'ত। তবে ঠিক উড়িয়ে দিতেও পারতাম না, কারণ দেখতাম ঠাম্মা স্নান পূজা সেরে সাষ্টাঙ্গে কথকঠাকুরকে প্রণাম করতেন ও একমুঠো খুচরো পয়সা দক্ষিণা দিয়ে বাড়ীর পথে রওনা দিতেন। তাই আমিও ভয়ে ভয়ে ঠাকুরমশাইকে একটা প্রণাম ঠুঁকেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালিয়ে যেতাম। তাড়াতাড়ি কেন? আরে, মোড়ের দোকানে তেলেভাজা, কচুরী আর জিলিপী যে আমার অপেক্ষাতেই আছে।

পরে বাড়ীতে ঠাম্মার কাছে জেনেছিলাম মহাভারত একটি বিশাল বড় হিন্দু ধর্মপুস্তক। শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব সংস্কৃতশ্লোক বলেছিলেন এবং গণেশঠাকুর চারহাতে লিখে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সব ভারতীয় ভাষায় ত' বটেই, পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই এর অনুবাদ হয়েছে। মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার কাছে সিঙ্গিগ্রামের শ্রীকাশীরাম দাস। সেই সংকলন আনুমানিক ১৬১০ খৃষ্টাব্দে প্রথম পঠিত হয়। খুব শীঘ্রই জনসাধারনের উচ্ছসিত প্রশংসা অর্জন করে এবং প্রচারিত হয়।

স্থান, কাল ও পাত্রভেদে বিষয়ের মূল্যায়ণ পরিমার্জন এবং পরিবর্তন নিত্যই ঘটে। অশীতিপর বয়সে আমারও মহাভারত পড়ার ইচ্ছা জাগল। কাশীরাম দাসের বদলে উইকিপিডিয়ার শরণাপন্ন হতে হ'ল। দেবনাগরী অক্ষরে সংস্কৃত শ্লোক ও তার ইংরাজি তর্জমা পড়তে আরম্ভ করলাম। সত্যই "মহাভারতের কথা অমৃতসমান।" শুনলে "পূণ্যবান" হয় কি না জানিনা, তবে জীবন সুখময় ও আনন্দময় করার নির্দেশনা পাওয়া যায়। সেই উপলব্ধ জ্ঞান ও আনন্দ সবাইকে বিলিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা করছি।

আমরা সবাই জানি, যুধিষ্ঠির দু'বার পাশাতে শকুনির কাছে হেরে যান। পণের শর্ত অনুযায়ী পঞ্চপাণ্ডব বার বৎসর বনবাসী হ'ন। পত্নী দ্রৌপদী ও মাতা কুন্তীও সঙ্গে ছিলেন। বনে মৃগয়ায় পশু, পাখী শিকার এবং গাছের ফল সংগ্রহ করে তাই খেয়ে জীবন রক্ষা করতেন। সেই বনপর্বেরই একটি গল্প বলছি।

অল্প ক'দিন বাদেই বনবাসের শেষ ও বৎসরকাল অজ্ঞাতবাস আরম্ভ হবে। সেদিন সমস্ত দিন পরিশ্রম করে পাঁচ ভাই ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত। যুধিষ্ঠির ছোট ভাই নকুলকে বললেন গাছে চড়ে দেখতে কোথাও পুকুর দেখা যায় কিনা। নকুল গাছে উঠে দেখে বললেন – 'না,

পুকুর দেখছিনা বটে, তবে পুকুরের ধারে কাছে যেসব গাছ জন্মায় তা দেখছি আর অনেক বকের ডাক শুনছি। অতএব জল কাছেই আছে, এ'টা নিশ্চিত।' তাই শুনে যুধিষ্ঠির নকুলকেই একটা ঘড়া দিয়ে পাঠালেন জল ভরে আনতে। ঘুরতে ঘুরতে অল্প দুরেই একটা সুন্দর পুকুর, নকুল আবিষ্কার করলেন। তার জলও কাকচক্ষুবৎ স্বচ্ছ। আশে পাশে জনপ্রাণী নেই, শুধু অন্য পাড়ে অনেক বক দাঁড়িয়ে আছে। তৃষ্ণার্ত নকুল জল খেতে যাচ্ছেন। হঠাৎ দৈববাণী হ'ল – 'এ পুকুর আমার। আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এই জলস্পর্শ করলে পরিণাম ভয়াবহ ও অবশ্যম্ভাবী।' আশে পাশে মানুষ দেখতে না পেয়ে, নকুল স্থির করলেন সর্বাগ্রে তৃষ্ণা নিবারন, তারপর শব্দের উৎস অনুসন্ধান। তাই, ঘড়া রেখে আঁজলাভরে জল মুখে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

নকুলের আসতে দেরী দেখে যুধিষ্ঠির সহদেবকে বললেন -'দেখ ত' তোমার দাদার এত দেরি হচ্ছে কেন? তুমিই এগিয়ে গিয়ে তোমার সহোদর ভাইকে এবং ঘড়া ভরে জল নিয়ে এস।' সহদেব তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লেন। পুকুরের কাছে গিয়ে দেখেন মৃত দাদার দেহ। শোকে অভিভূত হয়ে পড়লেন। এদিকে তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, তাই পুকুরের ধারে গেলেন। তখন আবার দৈববাণী হ'ল – 'এ পুকুর আমার। আমার প্রশ্নের সদুত্তর না দিয়ে এই জলস্পর্শ করলে পরিণাম ভয়াবহ ও অবশ্যম্ভাবী।' সহদেব দৈববাণী উপেক্ষা করে জলে হাত ঠেকালেন ও তৎক্ষণাৎ ঢলে পড়লেন।

দুই ভাইয়ের দীর্ঘ বিলম্ব যুধিষ্ঠিরকে খুবই বিচলিত করল। তিনি অর্জুনকে ডেকে বললেন 'তুমিই আমাদের সবাইকে বিপদের থেকে রক্ষা করে এসেছ। যাও, দুই ভাইকে বিপন্মুক্ত করে জল নিয়ে এস।' অর্জুন ধণুর্বান ও উন্মুক্ত তরবারী নিয়ে ভাইদের সন্ধানে রওনা হলেন। পুকুরের কাছে দুই ভাইয়ের মৃতদেহ ও জলের ঘড়া পড়ে আছে দেখে জঙ্গলের মধ্যে নরখাদক জন্তুর সন্ধানে অনেকক্ষণই ঘুরলেন। ব্যর্থ প্রচেষ্টায় আরওই তৃষ্ণার্ত হয়ে পুকুরের দিকে যাওয়ামাত্রই দৈববাণী হ'ল -'এই পুকুর আমার। ওহে কৌন্তেয়, আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিলেই জল খেতে ও ঘড়া ভরে নিতে পারবে।' অর্জুন বিরক্ত হয়ে বললেন -'কে তুমি, মৃত্যুর আশঙ্কায়ে অলক্ষ্যে থেকে আমাকে ভয় দেখাচ্ছ? সাহস থাকে ত' সামনে এস। জান ত' আমি শব্দভেদীবানেও সমান পারদর্শী।' এই বলে অর্জুন সমস্ত আকাশ ছেয়ে তীর ছুঁড়তে লাগলেন। আবার দৈববাণী হ'ল -'ওহে পার্থ, ক্ষমতা প্রদর্শণের দরকার নেই। আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে যথেচ্ছ জল পান করতে এবং নিয়ে যেতে পারবে। নচেৎ মৃত্যু অনিবার্য।' সেই দৈববাণী অগ্রাহ্য করে জলস্পর্শ করামাত্রই অর্জুন মারা গেলেন।

আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল। যুধিষ্ঠির উতলা হয়ে ভীমকে ডেকে বললেন -'বহুক্ষণ ত' হ'ল, তিন ভাইয়ের দেখা নেই। ওরা কি কোন বিপদে পড়ল? না কি জলের সন্ধানই পায় নি? যাও ভীমসেন, তুমিই ওদের সবাইকে নিয়ে এস।' ভীম পুকুরের কাছে গিয়ে তিন ভাইয়ের মৃতদেহ দেখে বিমর্ষচিত্তে ভাবলেন। যক্ষ বা রাক্ষস যেই হোক, এই তিন ভাইকে যখন পরাস্ত করেছে, সে খুবই বলশালী। তার সঙ্গে যুদ্ধ ত' করতেই হবে। তৃষ্ণা নিবারনের জন্য তাই তিনি পুকুরের দিকে এগোলেন। এবার দৈববাণী হ'ল -' হে যুবক, হঠকারী হইও না। এ পুকুর আমার। আমার প্রশ্নের সদুত্তর না দিয়ে এই জলস্পর্শ করলে পরিণাম ভয়াবহ ও অবশ্যম্ভাবী।' ভীম ভাবলেন সেই অমিত বলশালীর বিরুদ্ধে লড়বার

আগেই জলপান প্রয়োজন। তাই তিনিও দৈববাণী উপেক্ষা করে জলস্পর্শ করা মাত্রই ধরাশায়ী হলেন।

অস্থির মনে অপেক্ষা করতে করতে যুধিষ্ঠির ভাবলেন হিংস্র জন্তুর আক্রমন অকল্পনীয়। এই জঙ্গলে কি কারুর অভিশাপ আছে? না কি জলের অনুসন্ধানে ওরা এখনও সবাই ঘুরছে। নিজেই সরেজমিনে বের হলেন। দেখলেন জঙ্গলে শুধুই হরিন আর শুয়োর। সুন্দর ফুলভরা গাছে পাখিরা কিচির মিচির করছে। ফুলের মধু খাচ্ছে অসংখ্য মৌমাছি ও প্রজাপতি। উৎকন্ঠিত মনে আরও কিছুটা এগিয়ে গেলেন। অনেকটা দুরে পুকুরের পাড় ও সেখানে একটি বক চোখে পড়ল। আরও খানিকটা এগিয়ে দেখেন সর্বনাশ। চার ভাইয়ের মৃতদেহ মাটিতে পড়ে আছে। শরীরে অস্ত্রাঘাতের চিহ্নমাত্র নেই। আশে পাশে কোন জন্তু বা মানুষের পায়ের ছাপও খুঁজে পেলেন না। এ'কি তবে দুর্যোধনের কাজ? চর পাঠিয়ে বিষপ্রয়োগ? পুকুরের জলে বিষ মেশান হয়েছে বলে ত' মনে হচ্ছে না। ভাইদের শরীরে ত' বিষের বিকৃতি নেই। এরা প্রত্যেকেই বীর্যবান, বলশালী পুরুষ! তাহলে কি সেই দুষ্ট দুর্যোধনের প্ররোচনায় কোন গন্ধর্ব এদের যম দুয়ারে পাঠাল? যুধিষ্ঠির গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন। বিহ্বলিত হৃদয়ে যুধিষ্ঠির ভাইদের আন্তেষ্টিক্রিয়ার জন্য জলের দিকেই এগোতে লাগলেন।

হঠাৎ দৈববাণী হল -'আমি সামান্য একটি বকপক্ষী মাত্র, ছোট মাছ খেয়েই জীবনধারন করি। এই পুকুর আমার। আমিই তোমার চার ভাইকে যমদ্বারে পাঠিয়েছি। তুমিও আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জলস্পর্শ করলেই, পঞ্চম মৃতদেহ হয়ে যাবে। অতএব, হে কৌন্তেয়, হঠকারী না হয়ে আমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়ে যথেচ্ছ জল নিয়ে যাও।'

উত্তরে যুধিষ্ঠির বললেন -'আপনি যে সামান্য বক নন সে সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। আপনি নিশ্চয় কোন রুদ্র, বসু অথবা মরুৎ দেব, আপনাকে প্রণাম। কোনও দেবতা, গন্ধর্ব, অসুর বা রাক্ষস এদের পরাস্ত করতে পারেনি। হিমালয়, পরিযায়ী, বিন্ধ্য এবং মলয় পর্বতপ্রমান আমার ভাইদের আপনি নিপাতিত করেছেন! আপনার অপরিসীম শক্তির পরিচয় পেয়েছি। এখন আপনার প্রকৃত পরিচয় ও আমার ভাইদের শাস্তির কারণ জানতে আমি উৎকন্ঠিত। দয়া করে আমাকে বলুন।

অবোক বিস্ময়ে যুধিষ্ঠির দেখলেন বকের আকৃতি ক্রমশঃ বড় হতে হতে আকাশচুম্বী হ'ল। বক বলতে আরম্ভ করলেন -' আমি এক যক্ষ। এই পুকুর আমার। আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এর জলে হাত দিলে মৃত্যু অনিবার্য। বারংবার সাবধান করা সত্ত্বেও তোমার ভাইরা গ্রাহ্য করেনি। তাই তাদের এই পরিণাম। হে কৌন্তেয়, আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে তুমি যথেচ্ছ জল নাও।'

যুধিষ্ঠির বললেন -'হে মহামহিম বক, পরের দ্রব্যে আমার কোনই লিপ্সা নেই। হে প্রভু, আপনি প্রশ্ন করুন। আমি আমার জ্ঞান ও বুদ্ধি অনুযায়ী উত্তর দেব। ধার্মিক ব্যক্তি কখনই দম্ভপ্রকাশ করেন না।।'

মহাভারতকারীর গণনায়, বকরূপী যক্ষ এই সময়ে তেত্রিশটি প্রশ্ন করেছিলেন। তবে

প্রত্যেকটি প্রশ্নের মধ্যেই তিনটি বা চারটি প্রশ্ন নিহিত ছিল। সেই গণনায় প্রশ্নসংখ্যা হয় একশ' ছাব্বিশ। যদিও প্রত্যেকটি উত্তর যথেষ্টই অর্থবহ, রচনা নাতিদীর্ঘ করার প্রচেষ্টায় অল্প কয়েকটি উত্তরই এখানে স্থান পেয়েছে।

পৃথিবীর থেকে ভারী হলেন মা – জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী
স্বর্গের থেকে উচ্চে পিতা – পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম পিতাহি পরমন্তপঃ।পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতা।।
মনই সবচেয়ে দ্রুতগামী – যেই মনে হবে কোলকাতার ছবি ফুটে উঠবে।
সংখ্যায় ঘাসের চেয়ে অধিক চিন্তা – বলাই বাহুল্য।
ধর্মপুস্তক পড়লে জ্ঞান বাড়ে।
অনুশীলনে ক্ষমতা বাড়ে ।
বৃদ্ধের সেবায় বুদ্ধি বাড়ে – এই তিনটিই প্রত্যেকেরেই স্বজ্ঞাত।
অন্যের নিন্দা ব্রাহ্মণের পাপ – দেবকর্মে আমরা সবাই ব্রাহ্মণ।
ধর্মরক্ষায় বিমুখতায় ক্ষত্রিয়ের পাপ – আত্মরক্ষায় সবাই ক্ষত্রিয়।
সাধুরা বিশ্বের কল্যাণ কামনা করেন – সবাই সাধু। বিভিন্ন সময়ে একই ব্যক্তিব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা সাধুরূপ ধারন করেন অনুপলব্ধে।
আমাদের সহায় – বিদেশে বন্ধু, সংসারে স্ত্রী, রোগে চিকিৎসক এবং আসন্ন মৃত ব্যক্তির দান – সহজাত জ্ঞান কিন্তু উপেক্ষিত।
সুস্থ থাকাই ধর্ম, ধর্মাচরনই সুফল দেয়, মনকে সংযত ও শান্ত রাখলে দুঃখ হয় না, ভগবানের সঙ্গ সর্বদাই আছে – কিন্তু তবুও——
অহংকার ত্যাগ করলে সবাই সহচর হয়
ক্ষিপ্ততা ত্যাগ করলে আফশোষ থাকে না
লোভ ত্যাগ করলে ধন বাড়ে
চাহিদা ত্যাগ করলে সুখ বাড়ে – চারটিই অমূল্য নির্দেশনা।
শেষ পাঁচটি মন্ত্রবৎ। তাই সংস্কৃত উক্তি এবং বাংলা অনুবাদ পেশ করছি।

মোহ হি ধর্মমূঢ়ত্বং মানস্ত্বাত্মাভিমানিনা।
ধর্মনিষ্ক্রিতাঽহলস্যং শোকস্ত্বজ্ঞানমুচ্যতে।
নিজের দায়িত্বে অজ্ঞানতাই মোহ, অহংকারই ক্লেশ, কর্তব্যপালনে অনিচ্ছাই আলস্য এবং অজ্ঞানতাই শোক।
পঞ্চমেঽহনি ষষ্ঠেবা শাকং পচতি স্ব গৃহে।
অনৃণী চাপ্রবাসী স বারিচর মোদতে।।
দিনের পঞ্চম বা ষষ্ঠভাগে নিজের বাড়ীতে সামান্য শাক-ভাত খেয়েও যে কোন ব্যক্তি ঋণমুক্ত অবস্থায় নিজস্থানে সুখী থাকতে পারেন।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমালয়ম।
শেষাঃ স্থাবরমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃপরম্।।
প্রতিদিন প্রাণিদের মৃত্যু হচ্ছে। তথাপি জীবিতরা চিরজীবি থাকতে চায়। এর থেকে আশ্চর্য আর কি হতে পারে?

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নৈক ঋষির্যস্য মতঃ প্রমানম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।।
তর্কে অমিমাংসিত, বিভিন্ন শ্রতির মত বিভিন্ন, কোন ঋষির মতই প্রতিষ্ঠিত নয়। ধর্মের তত্ব গুহায় লুক্কায়িত। অতএব 'মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে করে গমন হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয় সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্তি ধ্বজা ধরে আমরাও হব বরণীয়।'

অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে সূর্যাগ্নিনা রাত্রিদিবেন্ধনেন।
মাসর্তুদর্ব্বী পরিঘট্টনেন ভূতানি কালঃ পচন্তিতি বার্তা।।
এই অজ্ঞানতাপূর্ণ বিশ্বরূপ কড়াইতে সূর্যরূপী অগ্নি, দিন-রাত্রিরূপী জ্বালানি এবং মাসরূপী হাতা দিয়ে ঘুঁটিয়ে মহাকাল প্রাণীদের পাক করছে – এটাই বিশ্বের একমাত্র সংবাদ।

যুধিষ্ঠিরের জ্ঞান ও বিচক্ষণতায় অত্যন্ত খুশী হয়ে বক বললেন -'তুমি যথেচ্ছ জল নিতে পার। আমি তোমার উত্তরে এতই খুশী যে তোমার একটি ভাইয়ের প্রাণ দেব। বল, কোন ভাইকে চাই।' যুধিষ্ঠির নকুলের প্রাণভিক্ষা চাইলেন। বিস্মিত বক বললেন -'ভীম এবং অর্জুন তোমার সবচেয়ে প্রিয়। তাদের বাদ দিয়ে নকুলের প্রাণভিক্ষা করলে কেন?' উত্তরে যুধিষ্ঠির বললেন -' আমার ত' দুই মা। কুন্তি মা'র সন্তান আমি, মাদ্রী মার জ্যেষ্ঠ নকুল। দুই মায়ের সন্তানই জীবিত থাক।'
শোনামাত্রই বক মনুষ্যাকৃতি ধারন করে বললেন -'আমি ধর্মরাজ, যম, তোমার পিতা। তোমার জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেচনা বিচারের জন্যই এই নাটকের অবতারনা। তুমি সেই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছ। সানন্দে তোমাকে পুরস্কৃত করি-

তোমার চার ভাইই পুনরুজ্জীবিত হউক।

Dhaaker Taal -
Rumku Chowdhury

কালশিটে কাত্তিক

প্রদীপ্ত দে, কলকাতা

এই মহারাজ পাড়ায় সম্প্রতি ফেরত এসেছেন। মানে আনা হয়েছে। খুলেই বলি তা'লে!

ইনি আগে খুবই দুর্দান্ত ছিলেন। এঁর প্রাণের বন্ধু, পাটকিলে। পাটকিলে আর ইনি মিলে, দেড়খানা গলি আর খানিকটা 'বড় রাস্তা' জুড়ে, এলাকা শাসন করতেন। নিত্যদিন ঝগড়া চ্যাঁচামেচি অশান্তি, রাত নামলেই গ্যাং ওয়র! মানুষের ধমক ধামক তো তুচ্ছ, বেশি রাত্তিরের দিকে ঝগড়া থামাতে, জলকামান অবধি তাগ করতে হয়েছে! মানে মগে করে বা বালতি বালতি জল ছুঁড়ে...যাকগে!

তার পর একদিন সকালে, পাশের পাড়ায় একদল হনুমান এল। মাঝে মাঝেই আসে। আমাদের পাড়াতেও আসে। জায়গাটা শহরতলী'তে হওয়ায় কাছাকাছির মধ্যে বনবাদাড় সবুজ এখনও কিছু কিছু আছে। সেখান থেকেই আসে।
হনুমান বাঁদর শিম্পি – এদের অ্যাটিটিউড'ই হ'ল, ক্রিকেট মাঠে চিউয়িং গাম চিবোনো ভিভ রিচার্ডস'এর মত, কেয়ারলেস, আমুদে, 'যা যা তোর মত অনেক দেখেছি' গোছের। ওঁরা পাড়ায় এলে ভুলো'দের চিৎকারেই সেটা টের পাওয়া যায়। ভুলো'রা মানুষের সঙ্গে একসাথে থাকে। মাটিতে। সে তবু ঠিক আছে, কিন্তু তাদের আকাশসীমায়, মানুষ নয় অথচ মানুষের মত দেখতে হনু'দের, ল্যাজট্যাজ নিয়ে, উদ্ভট ধরণের স্পায়ডাম্যান মার্কা চলাফেরা, ওদের মোটে পছন্দ নয়। ফলে, দু'পক্ষে বনিবনা নেই। দেখাসাক্ষাৎ হ'লে চিৎকার চ্যাঁচামেচি, প্রতিবাদ, বাওয়াল, খুব চলে।

হনু'রা এমনিতে কাউকে ঘাঁটায় না। বিশেষ শব্দ'ও করে না। গাছে, পাঁচিলে, কার্নিশেই হুপহাপ বড় লাফ মেরে, চলাফেরা করে। কাছাকাছি দোকানে, বাড়িতে গাছে, নিজেদের 'তোলা' তুলে, ভুলো'দের তাচ্ছিল্য করে, দলবেঁধে আবার চলে যায়। ক্ষয়ক্ষতি বলতে, দু'একটা টালি ভাঙে, গাছের ডাল ভাঙে। একবার আমাদের ছোট গাড়িটা – গ্যারাজের মধ্যে থেকে গরমে ঘেমে যাওয়ায়, বেরিয়ে পথের ধারে, দুটো গাছের মধ্যিখানে ছায়াটায় দাঁড়িয়ে একটু হাওয়া খাচ্ছিল। হনুমান'রা, বেচারার ছাদটাকে হাইজাম্পের প্ল্যাটফর্ম ঠাউরেছিল। সে যাত্রায়, গাড়ির ছাদ, টোল খেয়ে দেবে গেছিল! ভাগ্যিস ভেতরে কেউ ছিল না। পরে আবার ভেতরের দিক থেকে ঢুঁসো মেরে গাড়ির টেকোমাথা সমান করতে হয়েছিল।

তা, আমাদের মহারাজ – সে'দিন কী মতি হ'ল,পাটকিলে'কে সঙ্গে করে, এঁদের সাথে গেলেন যুদ্ধ করতে। পাশের পাড়ায়। মানে, নিজেদের মধ্যে যতই গ্যাং ওয়র হোক, বিজাতীয় শত্রু এলে আমরা কিন্তু ভাই একসাথে লড়ব – এই ব্যাপারটা মানুষের মধ্যে আর তেমন নেই, সেখানেও গ্রুপের ভেতরে গ্রুপ, তার ভেতরে গ্রুপ – কিন্তু ওদের মধ্যে এখনো আছে ।

যাইহোক, সেদিন অবস্থা খানিক বেগতিক ছিল। নীচ থেকে উপর বরাবর, অক্লান্ত সরব প্রতিবাদ আর ও পক্ষের আপাত নির্বিকার নীরব উপেক্ষা দুটোই চলছিল। নিরন্তর চ্যাঁচামেচি'তে হনু'দের মধ্যে একজনের মেজাজ খুবই বিগড়ে যায়।
তিনি ওপর থেকে নেমে আসেন, সমুখ সমরে। মহারাজ, অনেকক্ষণ ধরে মাটি থেকেই হুংকার দিচ্ছিলেন। কিন্তু, হঠাৎ করে এই পালটা অ্যাটাকে, ক্লোজ কমব্যাট'এ, হনুমানের হাতে একটি বিরাশি সিকের চড় খেয়ে যান! সামলে ওঠার আগেই, ল্যাজসমেত হনুমান, হাইজাম্প' দিয়ে নিরাপদ দূরত্বে হাওয়া! পাটকিলে, হাওয়া খারাপ দেখে আগেই সরে পড়ছিল! মহারাজের অবস্থা দেখে তদ্দন্ডে ব্যাক আউট করে চোঁ চাঁ দৌড়! সাদাভুলো কালোভুলো'ও যথাসাধ্য করে যুদ্ধ করে ফিরে এল। কিন্তু, হনু'দের সাথে মুখোমুখি যুদ্ধে এই শোচনীয় পরাজয়ের পর, নিদারুণ অপমানে, মহারাজ আর পাড়া'তেই ফিরলেন না। সাদাভুলো কালোভুলো পাটকিলে'রা রোজকার মত ডিনার টাইমে' ঠিক আসত। ক'দিন ধরে, মহারাজ'কে তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছিল না।

তার পর এই সেদিন শুনলাম, তিনি নাকি বিবাগী হয়ে গেছিলেন। আমাদের পাড়া'টা থেকে দু'কিলোমিটার দূরেই বাজার এলাকা, একটি শ্মশান'ও আছে। সেই শ্মশানের কাছে মহারাজ'কে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছিল।
সম্প্রতি কারা যেন তাকে তুলে, রিকশায় চাপিয়ে, আবার পাড়ায় ফেরত এনেছে। চেনা মানুষ দেখে, 'মহারাজ'ও তাঁর অজ্ঞাতবাস শেষ করে, রিকশা'য় চেপে বাড়ি ফিরতে আপত্তি করেন নি।

অন আ সিরিয়াস নোট, আমার কাছে, এই ঘটনাটির একটি দিক হল, আমাদের পাড়ার মানুষের সংবেদনশীলতা। নিজস্ব কেনা নয়, পোষা নয়, সামান্য একটা পথ কুকুর, তাকে অন্য পাড়ায় খুঁজে পেয়ে, 'বাড়ি চল্ ' বলে, রিকশায় চাপিয়ে, ফেরত নিয়ে আসতে পারেন, এমন মনের মানুষ এখনও আছেন, বসবাস করেন আমার দু'কিলোমিটারের মধ্যেই, এটা ভেবে আমার ভালো লাগে।

ইদানীং ডিনারের সময়ে, আবার সবাইকে একসাথে পাওয়া যাচ্ছে, তবে মহারাজের মেজাজটা এখনও আগের মত নেই। মাস দুই আগেকার, মানে চৈত্র মাসের সেই হাঁকডাক, চনমনে ব্যাপারটা যেন নেই। ইদানীং দারুণ ঘেমো গরমের মধ্যে, প্রায়ই চুপচাপ শুয়েবসে থাকেন। ছবিটবি তুলতে গেলে বিষণ্ণ হাসি দেন। হনুমানের চড় খেয়ে ডান চোখে একখানা কালশিটে, চোয়ালে ব্যথা, বোধহয় ক্যানাইন টিথের গোড়া নড়ে গেছে! ইদানীং রাত্রে সামান্য ভাত আর নরম সেদ্ধ ছাঁট মাংস ছাড়া আর কিছু খাচ্ছেন না। পাটকিলে আসে। সে'ও অবশ্য তা'ই খায়। ঘোরাঘুরি শোঁকাশুকি করে চলে যায়। মহারাজের মন ভালো নেই! তবে, হনুমান'রা আবার এলে কী হবে তা বলা যায় না

Musica

Indian School of Music & Performing Arts

Musica is an accredited music school in Austin TX.

It is found by the award-winning Indian singer & music teacher Jayeeta Dasmunshi. She is the winner of a reality show and has performed at many esteemed stages including the Rashtrapati Bhavan in India and London Consulate programs, NABC 2015. and many other events.

Musica specializes in various genres of music, including Hindustani Vocal, Devotional Songs, Rabindra sangeet, and Bollywood songs.

musicamusicschool@gmail.com

Jayeeta Dasmunshi

Tel: +1 914-310-9165

Musicatx.ord

https://www.facebook.com/JayeetaDasmunshi/

মিনি

শুভা আঢ্য

বিকেলের দিকে লাল ইটের দোতলা বাড়ীটার সামনে দিয়ে গেলে রোজই দেখা যায় ঝুল বারান্দার একপাশে একটা রং চটা, নড়বড়ে বেতের চেয়ারে বসে বুড়ো মানুষটি সামনের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে থাকেন। রোগা মুখটি ঘিরে ফিনফিনে পাতলা কিছু সাদা কোঁকড়া চুল হাল্কা হাওয়ায় ওড়ে। দিগন্তের কোল ঘেঁসে উড়ে যায় একঝাঁক সাদা পাখী কে জানে কোন সুদুরের উদ্দেশে, তাদের পাখার সনসনানী আর বাড়ীর সামনের ধুলো ধুসর মাঠে খেলা সারা ছোট খোকা শুকুদের কচি গলার কলকাকলী ধীরে ধীরে কমে গিয়ে দূরে মিলিয়ে যেতে থাকে। সূর্যদেব অস্ত যাবার আগে তাঁর শেষ আলোর আবিরে পশ্চিমের আকাশ হোলী খেলায় মেতেছে। ভেসে থাকা আদুরী মেঘগুলোর গায়ে গোলাপী ওড়নার আস্তরন, গাছের মাথায় হাওয়ার সংগে খেলা চঞ্চল সবুজ পাতায় পাতায় সোনার ঝিলিক চমকে উঠছে।

আকাশ পৃথিবী জুড়ে এত রং, তিনি কিন্তু দেখতে পান না। তাঁর চোখের আলো মুছে গেছে বেশ কয়েক বছর আগে। কতদিন হয়ে গেছে, লাল মাটির পথ, বেড়ার গায়ে অপরাজিতার নীল, সদ্য ফোটা চাঁপা ফুলের লাজুক হলুদ, বাঁচার দোলনায় দোল খাওয়া সবুজ টিয়া এসব রং মিলিয়ে গেছে এক ছায়া ছায়া কুয়াসার মধ্যে। অনেক কালের চেনা রঙ্গীন পৃথিবী শুধু মনের কোনে উঁকি ঝুঁকি মারে। গত দিনের স্মৃতির মত। ধরা ছোঁয়া দেয়না শুধু হাতছানি দিয়ে ইশারা করে। তাই তাঁর ভালো লাগে দিনের শেষ রোদ্দুরের আলো এসে চোখে লাগলে। তাঁর জীবনের গভীর কালোর মধ্যে একটু রং এর আভা, অনেক পিছনে ফেলে আসা দিনগুলোর চেনা ছোঁয়া। তাঁর চোখে তো আর আলো ধরা দেবেনা তাই রোজই তিনি এই সময়ে এসে বসেন বারান্দার কোনে, অস্তগামী রবির শেষ কিরনটির শেষ স্পর্শটি পেতে। তিনি জানেন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পশ্চিম দিগন্তে সূর্যাস্তের সংগে সংগে গাড় অন্ধকার নেবে আসবে, চরাচর জুড়ে। তাঁর জগতের মতই অন্ধকার।

বারান্দার নিচে সাইকেলের আওয়াজের সংগে সংগে কিশোর গলার ডাক,- “কি ঠাকমা, কেমন আছো গো?” উত্তরের অপেক্ষা না করেই সাইকেলের ব্যস্ত সওয়ারী চলে যায়, তার আওয়াজটিকে পিছনে ফেলে। বৃদ্ধা একটু নড়েচড়ে বসে গায়ের আধময়লা চাদরটিকে জড়িয়ে নেন ভালো করে। শীত করছে বলে ঠিক নয়, যেন কোনোও হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসার কোমল আভাস পেতে। এই পৃথিবীর চলমান মিছিল নিরন্তর এগিয়ে চলেছে, শুধু তিনিই পিছিয়ে পড়েছেন। দিন আসে দিন চলে যায়, পুরোনো দিনের কথা মনের মধ্যে ছোট ছোট ঢেউ তোলে। ছোটো বেলা কবে যে চলে গেছে, তবু মনে হয় যেন হাত বাড়ালে ছোঁওয়া যাবে। মা, বাবা, ছোট ভাই ও অনেক ছোট একটি বোন। ছোট সংসার, আরো ছোট্ট বাড়ি। নানান অভাবের সংসার তবু নিবিড় এক স্নেহচ্ছায়া ঘেরা তপোবন। বাবার সুউন্নত, সুগৌর চেহারা মনে পড়ে আর মনে পড়ে রবি ঠাকুরের মত বুক ঢাকা রেশমের মত দাড়ি গোঁফ। ভোরের আলো ফোটার সংগে সংগে স্নান সেরে

নিতে নিতে শোনা যেত তাঁর শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারনে সুগম্ভীর বন্দনা স্তোত্র। সরু দালানে ততক্ষনে সাজানো হয়ে গিয়েছে হোমের সরঞ্জাম, আসনের সামনে সদ্য তোলা ফুলের থালা। বাবা এসে আসনে বসলে মা ও ভাই বোনের সংগে তিনিও কোমরে আঁচল জড়ানো খড়কে ডুরে শাড়িটি পরে বসতেন হোম কুন্ডটিকে ঘিরে। মায়ের সিঁদুর টিপ পরা ঈষৎ নত শ্যামলী মুখটি ঘিরে থাকতো উজ্জ্বল লাল পাড়। বাবা সকলের হাতে দিতেন ফুল। সুরেলা মন্ত্রের ছন্দে ছন্দে আগুনে পড়তো ঘি এর আহুতি আর সৃষ্টি হতো এক স্বর্গীয় পরিবেশ। মন্ত্র বোঝার কোনও দায় ছিলনা শুধু কানে শুনে চলে যাওয়া যেতো কোন এক অপার্থিব লোকে যেখানে অভাব, অনটন, দুঃখ, ক্লেশ কিছুই পৌঁছতে পারতো না। বৃদ্ধা দুটি হাত জোড় করে বুক ভরে নিঃশ্বাস নেন, যেন সে দিনের সেই সুগন্ধ, সেই দৈব ক্ষণটি তাঁর কাছে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

শান্ত পায়ে সন্ধ্যা এসে পৃথিবীর দরজায় ক্ষণেক দাঁড়ায়। আসন্ন রাত্রির কালো চুলে তার প্রথম তারাটি পরিয়ে দিয়ে আবার নিঃশব্দে দিগন্তের বুকে মিলিয়ে যাবে। কাছের বাড়িগুলোর থেকে দু' একটি শাঁখের আওয়াজ ভেসে আসে। বারান্দার কার্নিসের নিচে পায়রাদের বাসা। সারা দিনের ব্যস্ত আসা আর যাওয়া, আর অবিরত বাকুম বাকুম। তাদের আর সাড়াশব্দ নেই। ঘরে ফেরা পাখিগুলো এখন বুঝি পাখায় মুখ গুঁজে ঘুমিয়েছে। বিশ্ব প্রকৃতি ধীরে ধীরে ডুবে যাবে গভীর অন্ধকারে। এবার তাঁকেও উঠে বারান্দা ছেড়ে ঘরের মধ্যে যেতে হবে। এটুকু তিনি নিজেই করতে পারেন। তবুও কেউ একজন আসবে, তাঁকে ঘরে পৌঁছে দিতে। এই অপারগতা, তাঁকে বড় কিন্তু করে। তবে উপায় কি? সবাই সব সময় মনে করিয়ে দেয় যতদিন বেঁচে থাকতে হবে তত দিনই পরনির্ভর হয়ে থাকতে হবে। আবার ভাবেন, করেই বা তিনি স্বাধীন ছিলেন?

রক্ষনশীল অন্দরের পরিধির বাইরে পা রাখার কোনোও সুযোগ ছিল না। ছোট ভাই বোন দু'জনেই যদিও সে সুযোগ পেয়েছে, কিন্তু সে জন্য তাঁর কোনোও অভিযোগ ছিল না। তাঁর জন্যে, কোনটা ভালো কোনটা মন্দ সে বিচার করবার জ্ঞান বুদ্ধি যে তাঁর নেই এ কথাটাই প্রমানিত ছিল। সে সব বিবেচনা করতে বড়রা থাকতে তাঁকে ভারতে দিতে হবে কেন? "করতে নেই" এ কথাটা কেন শুধু তাঁর বেলাতেই প্রযোজ্য এ নিয়ে প্রশ্ন করার প্রশ্নই ছিল না। তিনি যেন জেনেই এসেছিলেন জন্ম থেকেই তাঁর জন্য সংসারে একটি নীরব ভূমিকা নির্ধারিত হয়ে আছে, তাতে তিনি শুধু সবার কথা ও নির্দেশ মত অভিনয় করে যাবেন। মেয়েমানুষের জন্ম আবার তার চেয়ে বেশি কি মূল্য রাখে? 'জন্ম', সে কবে? কেউ কখন বলেনি। তখনকার দিনে কন্যার জন্ম সাধারণতঃ আনন্দের সংবাদ বাহক হয়ে আসতো না। কাজেই সেই দিনটি মনে রাখা নিয়ে মাথাব্যথা ছিল না কারোও। আবছা শোনা, শ্রাবনের এক ঘন বর্ষার রাতে তিনি তেরো বছরের মায়ের কোলে এসেছিলেন। শুধু সেই দিনটিই নয়, সেই বছরটিই বড় দুর্যোগময় ছিল। বিত্তশালী ঠাকুরদাদা, সুন্দরী অল্পবয়সী দ্বিতীয় নব বধুর পত্নীর প্ররোচনায় একমাত্র ছেলেকে একরাত্রে একবস্ত্রে বাড়ী থেকে রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর কপর্দক হীন বাবা স্ত্রী আর সদ্য জাত মেয়েকে নিয়ে কোথায়, কেমন করে বেঁচে ছিলেন সে কথা তাঁর জানা নেই। ওকালতি ছিল তাঁর পেশা কিন্তু ভালো উকিল হতে হলে মিথ্যার আশ্রয় নিতে তাঁর নৈতিক বাধা সৃষ্টি হতে থাকায় তিনি সে পেশা ছেড়ে কোনও এক সামান্য চাকরি নিয়ে সারা জীবন কষ্ট করে কাটিয়েছেন। যদিও মা বাবা কোনোও দিন বলেননি, তবু

আত্মীয়দের কাছে তাঁর 'অপয়া' নামে খ্যাত হতেও বেশি সময় লাগেনি। তাঁর জীবনে শুভ লগ্নের সংখ্যা অতি অল্প, তাই তাঁর প্রায়ই মনে হয় "অপয়া' নাম হয়তো তেমন ভুল না ও হতে পারে। এমনিতে নাম অবশ্য ছিল একটা। বেশ গাল ভরা নাম। কুন্দনন্দিনী। সে নামে অবশ্য কেউ কোনোদিন ডাকেনি। কোন এক পিসি যেন বলেছিলেন, ঐ তো কালো কুচ্ছিত মেয়ে, তার আবার নাম, "কুন্দনন্দিনী"। দাদার আদিখ্যেতা দেখে আর বাঁচিনে!! কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন! ডাকা হয় আবার 'নন্দিনী' বলে। হেসে আর বাঁচিনে বাপু। পিসির কথায় কেউ দোষ দিতে পারেনি। সত্যিই তো, নাম আর চেহারার মিল তো চেষ্টা করলেও পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া ঘরের মেয়েকে ঐ তোলা নামে কে আবার করে ডেকে থাকে? পিসির দেওয়া 'কুনি' নামটাই চালু হয়ে গিয়েছিল মুখে মুখে। এখন অবশ্য সে নামেও ডাকবার কেউ নেই। হঠাৎ ই মনে পড়লো, এক মেমসাহেব মিশনারী দুপুরে তাঁদের বাড়িতে এসে মেয়েদের বোনা ও সেলাই শেখাতেন। সেই মেমসাহেবের কাছেই তাঁর বর্ণ পরিচয় ও লিখতে শেখা। অনেক ধরে ধরে একবার খাতার পাতায় লিখেছিলেন—কুমারী কুন্দনন্দিনী বসু! সেই আঁকা বাঁকা অক্ষরে নিজের নাম দেখে ভালো লেগেছিল। একবার মনে হয়েছিল সকলে যদি মাঝে মাঝে 'কুন্দনন্দিনী বলে ডাকতো, এমন কি ক্ষতি হতো? সে ভাবনা মনেই থেকে গিয়েছিল, কাউকে কখনও বলার সাহস হয় নি।

বৃদ্ধার চোখের পাতায় আগত রাত্রির কালো ছায়া আসন পাতে। চেয়ারের গায়ে ঠেশ দেওয়া লাঠিটি নিয়ে বৃদ্ধা ওঠেনও স্খলিত পায়ে ঘরের দিকে পা ফেলেন। সাবধানে চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে এসে হাত বাড়িয়ে বিছানা পাতা ছোট চৌকিটি খুঁজে নিয়ে পা গুটিয়ে উঠে বসেন। মাথার ওপর গোটানো মশারী তাঁর মাথায় একটু ছুঁয়ে থাকে। কাল রাতের পর মশারী আর তোলা হয়নি বোধ হয়। বাড়ির ভেতর থেকে নানা রকম আওয়াজ শোনা যায়। মনে হয় হয়তো কেউ বেড়াতে বা দেখা করতে এসেছে। মাঝে মাঝে হাসির হুল্লোড় উঠছে। তাই বোধহয়, এখনোও কেউ এ ঘরে আসেনি। তিনি তাঁর ভাইয়ের সংসারে থাকেন। তাঁর চেনা জানা সকলেই আর কেউ কোথাও নেই। বিয়ে অবশ্য হয়েছিল। টাকার জোর ছিলনা, রূপের তো নয়ই। কাজেই, যে এই দু'টি ঘাটতিকে মনে রেখে স্বপ্নপুরের রাজপুত্তুর যে পক্ষীরাজে চড়ে আসবে এমন অবান্তর চিন্তা কবিগুরুর ভাষায় 'প্রায় পূর্ণিমাতে পৌঁছানো' পঞ্চদশী কুনির মনেও আসেনি। যিনি তাকে গ্রহন করেছিলেন সেই অনেক বেশি বয়েসের গুরুগম্ভীর মানুষটির প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা, ভয় আর ভক্তি মেশানো এক অনুভুতি ছাড়া আর কিছু ছিলনা। বিদ্বান স্বামী নিজের বই আর কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, ঘর সংসারের দিকে তাকাবার তাঁর সময় বা স্পৃহা কোনোটাই ছিল না। তা ছাড়া তিনি দেশপ্রেমী ছিলেন, অনেক রাত অবধি তাঁর ঘরে নিচু স্বরে আলোচনা চলতো। মাঝে মাঝে তিনি মাতৃভূমির শৃংখল-মোচন দায়, ইংরাজদের বিতাড়ন, ইত্যাদি বড় বড় কথা তাকে বোঝাতে চেষ্টা করতেন। ইংরাজ, মানে সাহেবদের জানার কোনোও অবকাশ তাঁর শুধু মাত্র ঐ মিশনারী মেমসাহেবের মারফত। সে তো বেশ ভালো মানুষ ছিল, আর একবার তাঁর সুন্দর চোখের প্রশংসাও করে ছিল, যা আর কারো কাছে তিনি শোনেননি। ইংরাজরা কেন খারাপ সে কথা জিজ্ঞাসা করবার সাহস হবার আগেই একদিন তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। কেন যে তাঁর স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন সে বৃত্তান্ত 'কুনি কে জানানোর প্রয়োজন কেউ মনে করেনি। কুনি ই বা লজ্জা শরম ভুলে শুধোবে কোন আক্কেলে?

মায়ের চোখের জল আর বাবার চিন্তাগ্রস্ত মুখ দেখে অহরহ নিজেকেই দায়ী করেছেন। প্রাণপনে প্রয়াস করেছেন অহোরাত্র নানা সেবা আর কাজের মধ্যে নিজেকে লুপ্ত করে দিতে। তারপর ধীরে ধীরে এই সংসারের চাকায় ঘুরে ঘুরে অন্য সেই ক'টা দিনের কথা আর মনে আনার প্রয়োজন হয়নি। নিরুদ্দিষ্ট সেই মানুষটির একটিমাত্র চিহ্ন শুধু আজও আছে শুভ্র চুলের মাঝখানে অস্পষ্ট সিঁদুরের একটি ক্ষীন রেখায়। নানা জনের অনেক অভিযোগ এসেছে ওই সিঁদুরের চিহ্নটির বিরুদ্ধে। এসেছে সমাজের রীতির দোহাই দিয়ে অনুযোগ। দশ বছর নিরুদ্দেশ থাকা মানুষ কে মৃত বলেই ধরে নেওয়া উচিত, এই তো শাস্ত্রের বিধান। কিন্তু কোন এক অজানা শক্তিতে, এতদিন ধরে তিনি এই বিগত দিনের প্রায় বিস্মিত স্মৃতিটিকে কিছুতেই মুছে ফেলতে দেননি। চিরটাকাল, সবার ইচ্ছের নিতান্ত অনুগত ভারবাহী তাঁর নেহাৎ ই সাধারণ জীবনে, নিজের ইচ্ছের দাবির এই একটিমাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সমুদ্র পথে ভাসমান জাহাজের মতোই জীবন সাগরে আমরা নিরন্তর ভেসে চলি যতদিন না থামার আদেশ আসে। বন্দরে বন্দরে একটু থেমে থাকা তারপর আবার চলার পালা। হয়তো কখনও অজানা এক পরদেশে, বৃষ্টিধারা মুখর ক'টি প্রহরের স্নিগ্ধগন্ধ নিবিড় করে ছুঁয়ে যায় মন। সেই শ্যাম বনরাজীর নিভৃত ছায়ায় খুঁজে পাওয়া এক বিদেশী পথিক, অজান্তে মনের গভীরে রেখে যায় অবিস্মরনীয় স্পর্শ। কুল ছেড়ে ভেসে যাওয়া এক নিঃসঙ্গ সায়াহ্নের নিভৃত ক্ষণে ইমনের সুর হয়ে সেই ছবিটি, সেই শেষ স্পর্শটি মনের দুয়ারে করে করাঘাত। যদিও তাকে ফিরে পাওয়া যাবেনা তবু যে সে একদিন ছিল এ কথা যে ধ্রুবতারার মতই চিরদিন মনের আকাশে স্থির হয়ে জ্বলে। তাকে মন অস্বীকার করবে কেমন করে? কেউ না জানলেও তার চিহ্ন থেকে যায়, সেও থাকে কিছু কল্পনায়, কিছু অব্যক্ত বেদনার অন্তরালে ।

এক এক সময় তিনি ভাবতে চেষ্টা করেছেন স্মৃতির আবছা ছবির সেই মানুষটিকে এমন করে ধরে রাখতে চাওয়া কি মনের অবান্তর কোনও আশার আলোর নিষ্ফল প্রচেষ্টা? ওই অল্প চেনা মানুষটি হঠাৎ যদি হারিয়ে না যেতেন তাহলে কি তাঁর এই জীবনটা অন্য খাতে বইতো? কোনোও দিন কি তিনি নেহাৎ সাধারণ 'কুনি' কে ভেঙ্গে গড়ে তাঁর আদর্শের আলোয় 'কুন্দনন্দিনী করে তুলতেন? এই প্রতি দিনের "রাঁধার পরে শাওয়া আর খাওয়ার পরে রাঁধার" চক্রব্যুহ থকে মুক্তি দিয়ে তাকে উন্মুক্ত আকাশের নিচে সফল কর্মময় জীবনের প্রাঙ্গনে তাকে নিজের সঙ্গিনী করে নিতেন? অবান্তর এমন অনেক প্রশ্ন সময়ে অসময়ে মনে ঝড় তোলে। সামান্য কোনোও কারণকে উপলক্ষ করে অভিমানের উত্তাল উদগীরন হয়, অবুঝ কান্নায়, বিতর্কে, ক্রোধে। তাঁর মত উদবৃত্ত মানুষের মনের কথা নিয়ে কার মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বা সময় কারই বা আছে? এমন আচরন কে "পাগলের কান্ড" বলে উড়িয়ে দেওয়া কিংবা "আদিখ্যেতা" বলে ব্যঙ্গ করাই তো স্বাভাবিক। "অভিমান"? সারা জীবন ঘাড়ে বসে অল্প ধংস করছে তার আবার কত ঢং!! সবাই যা বলে সবই একেবারে নির্জলা সত্যি, কিন্তু তবু অভিমান হয়। কার ওপর ঠিক বোঝা যায়না। যে নেই তার ওপর, না যে ভাগ্য তাঁকে এই নিঃস্ফল জীবনের মাঝখানে এনে ফেলেছ তার ওপর? বিধাতা কি এই কাহিনীটাই একটু অন্য রকম করে লিখতে পারতেন না ? সঙ্গীহীন একান্তে নিজের বিগত দিনের এলোমেলো কথা না ডাকতেই এসে উপস্থিত হয়। বৃদ্ধা সেই স্মৃতির বেড়াজালে হারিয়ে গিয়েছিলেন, চোখে আলো লাগতে চমকে উঠলেন। তারপরেই বলে উঠলেন, ওমা, এ যে আমার মৌমাছি গো। কখন এসেছো? এসো, এসো কাছে এসো। এবার মৌ এর চমকাবার পালা।

আরে, মিনি, তুমি জানলে কি করে যে আমি এসেছি? বৃদ্ধার মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে, গলায় কৌতুক। উত্তর দেন,— বুঝতে পারলে না তো? বলো দেখি কেমন ম্যাজিক দেখালুম? সত্যি কথা হ'ল, যেই আমার চোখটা নিজের কাজে ফাঁকি দিতে লাগলো, অমনি কান টা না চাইতেই, চোখের কাজ করতে রাজি হয়ে গেল। তাই পায়ের আওয়াজে, যতই আস্তে হোকনা কেন, ঠিক বুঝতে পারি কে এসেছে। আর তার ওপরে আছে তোমার পায়েলের রুনুঝুনু। এ সব ছাড়াও, কিছুক্ষন ধরে ঝরনার মত হাসির আওয়াজ শুনছি যে। এত হাসি ফোয়ারা আর কে আনবে, তুমি ছাড়া? যাক সে কথা, এবার এখানে কতদিন থাকবে বলো ?

মৌ কাছে এসে বৃদ্ধাকে জড়িয়ে ধরে, বলে,– কতদিন আবার? পড়াশোনা ফেলে এখানে বসে থাকলে আমার চলবে? আজ শনিবার আর কাল রবিবার, দুটো দিন।— বৃদ্ধার মুখে খুশি আর নিরাশার আলোছায়ার খেলা। বলেন,—বড় ভালো লাগে তুমি এলে, যেন আনন্দের হাট বসে। চলে গেলেই সব নিঃঝুম। মৌ বলতে থাকে,– আমারও তো এখানে এলে এতো ভালো লাগে। মামার কাছে যা ইচ্ছে আবদার, ভাইবোন দের সঙ্গে হৈ চৈ, গল্প, সিনেমা দেখা তার ওপর মামীমার হাতের নিত্য নতুন ভালো ভালো খাওয়া। তারপর তো আবার সেই হস্টেলের বিচ্ছিরি খাবার। বৃদ্ধা বলে ওঠেন— তা তো বটেই, এক শুধু আমিই যুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছি, তোমার জন্যে আর কিছুই করতে পারিনা । বৃদ্ধা, মিনির মায়ের বড় দিদি, অনেকটাই বড়, নামেই দিদি সম্পর্কে প্রায় মায়ের মতই। মিনি কচি বেলায় মাসীমা বলতে পারতোনা, বলতো 'মিমি'। বড় হবার পরেও সে নাম 'মিনি' ই রয়ে গেছে। মৌ এর কলকাতায় কলেজে পড়ার দৌলতে, ছুটিছাঁটাতে মামার বাড়ি আসার সুযোগ হয়। এবার মৌ বলে- মিনি ওঠো তো দেশি, চেয়ারটাতে একটু বসো, তোমার বিছানাটা ভালো করে পেতে দিই। বৃদ্ধা বলেন—দাঁড়াও, দাঁড়াও, এত ছটফটানি কেন রে বাবা? ও সব করতে হবে না, একটু পরে মেয়েরা এসে সব করে দেবে, রোজই করে দেয়। খাবার আনবে, বিছানা করবে, আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে তবে সব যাবে। তুমি এখন একটু কাছে বসে আমার সঙ্গে কথা বলো দেখি। মৌ তাঁর কথা শোনার কোনোও উৎসাহ দেখায় না, বৃদ্ধার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁকে চেয়ারে বসিয়ে বিছানার চাদর টেনে সোজা করে দেয়, একপাশে রাখা একটি জলের ঘটিতে উঁকি মেরে দেখে, জমা জলটা ফেলে দিয়ে নতুন জল ভরে আনে। বৃদ্ধা শুনতে থাকেন তার কাজের আওয়াজ। মৌ কথাও বলে চলে,– আচ্ছা মিনি, তুমি সারাদিনে কি ভাবো - বলোতো? বৃদ্ধার মুখে একটু হাসির আভাস দেখা যায়। বলেন,– ভাবনার কি শেষ আছে রে ভাই? এই ভাবি তোমার কবে বিয়ে হবে, রাজপুত্তুরের সঙ্গে তুমি নিজের ঘরে যাবে, এইসব আর কি। মৌ আপত্তি করে বলে,- দুর ছাই, কি সব আদ্যিকালের ভাবনা। আমি এখন আরো অনেক অনেক পড়বো, তারপর রাঙ্গা কাকা, ছোট কাকার মত বিদেশে যাবো, কত স্বপ্ন আমার, আর তুমি যত সব পুরনো চিন্তা নিয়ে বসে আছো। কি যে না ? বৃদ্ধা বলেন, শোনো শোনো, সবটা আগে শোনো, তার পরে না হয় রাগ কোরো। তারপর একটু ইতস্ততঃ করে বলেন,- আমারও একটা স্বপ্ন আছে, যার খবর কেউ জানেনা। কবে আছি, কবে নেই, আজ ভাবছি তোমাকে বলেই দিই। মৌ আপত্তি করে কিছু বলতে গিয়েও কি ভেবে চুপ করে গেল। শুধু বলল,– আচ্ছা বলো শুনি, দিন রাত্তির কি উলটো-পালটা স্বপ্ন দেখো তুমি। বৃদ্ধা বলেন- আমার স্বপ্নটাতে কিন্তু তুমি তো আছই তবে আমিও আছি। তাই এ স্বপ্নটা শুধু একা আমারই

নয়। মনে রাখবে তো? আর শোনো, আলোটার তো কোনোও কাজ নেই, ওটাকে নিভিয়েই দাও। মৌ গল্পের আঁচ পেয়ে বৃদ্ধার কাছে গিয়ে শুয়ে তাঁর কোলে মাথা রাখে। তাঁর নিস্প্রভ চোখদুটি সত্যিই এক স্বপ্ন দেখতে দেখতে সুদূরে হারিয়ে যায়। তিনি একটি শীর্ণ হাত মৌ এর মাথায় রেখে বলতে থাকেন, আর মৌ চুপ করে শোনে। খোলা দরজার পাল্লার ওপর তেরছা হয়ে পড়া এক ফালি চাঁদের আলোও যেন পা টিপে টিপে এসে গল্প শুনতে বসে। রাতের বাতাসে মাথা নাড়া নারকেলের পাতার সরসর আওয়াজ। তারমধ্যে থেকে থেকে, দূর কোন মন্দিরের ঘন্টা ধ্বনি ভেসে আসছে। বৃদ্ধা এক মনে বলে চলেছেন তাঁর স্বপ্নের কথা।-- বুঝলে মৌ, আজকাল চোখ বুজে চুপচাপ বসে থাকলেই দেখতে পাই শরৎ কালে নীল আকাশে ভেসে বেড়ানো সাদা মেঘের মতো বিশাল যেন এক রাজার বাড়ি। সামনে উঁচু দেউড়ির দু'পাশে রুপো বাঁধানো পাকানো লাঠি নিয়ে সবুজ-কালো পাগড়ি পরা দুই দারোয়ান। তাদের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে টুকটুকে লাল সুরকির রাস্তা। মোটা মোটা থামের পিছনে মত মত কাঠের দরজা। ব্যস্ত সব লোকজন গিসগিস করছে চারিদিকে। কেউ আসছে, কেউ যাচ্ছে, যাওয়া আসার আর শেষ নেই। দেখে দেখে আমি অবাক। শেষে আমি সদর পেরিয়ে পিছনের খিড়কি দরজা দিয়ে ভয়ে ভয়ে ঢুকেছি। মত উঠোনের চারপাশে ঘেরা উঁচু দালান আর সারী সারী অনেক অনেক ঘর। আমি খুঁজছি আর খুঁজছি আর খুঁজছি, কিছুতেই আর পাইনা। যত ঘর তত সুন্দর সুন্দর জিনিস। কত খাট পালঙ্ক, রেশমের পর্দা। ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে শেষে একজন কে ডেকে বলি, হ্যাঁ গো আমাদের মৌ কে তোমরা চেনো? সে তো এখানেই থাকে। কেউই বলতে পারেনা।

এ ঘর ও ঘর, গলি খুঁজি, সব খুঁজেই চলেছি, খুঁজেই চলেছি, হঠাৎ শুনি চেনা পায়ের শব্দ। ফিরে দেখি, ও মা এইতো আমার মৌটুসি, আমার মৌ! তোমার ছোট্ট কপালে টিপ, দু হাতে সোনার কাঁকন। কি সুন্দর লাগছে, আমার দু'চোখ জুড়িয়ে গেল। আমাকে দেখে তুমি অবাক হয়ে বললে, ও মিনি, তুমি? কখন এলে? কোথা দিয়ে এলে? আমি বলি- সেই তো অনেকক্ষন হলো এসেছি, ওই খিড়কি দরজা দিয়ে। কেউ তো তোমার কাছে নিয়ে যায় না আর আমার মনে হাজার ভাবনা, আবার বুঝি আমাকে সেই অনেক পথ ঘুরে ঘুরে ফিরে যেতে হবে। আর তো আমি ফিরতে চাই না, আমি যে আমার মৌ এর কাছেই থাকবো। এত কিছু করে তবে তোমার দেখা পেয়েছি। এর পর তুমি আমাকে নিয়ে এক বিরাট ঘরে গেলে। লোকজনের ওপর হুকুম হলো আমাকে চান করিয়ে, নতুন কাপড় পরিয়ে, খাইয়ে দাইয়ে সুস্থ করে তুলতে। তারপর তুমি সবাইকে ডেকে বললে- দেখো তোমরা সবাই, এই হলো আমার মিনি! আমার মনে হতে লাগলো যেন আমি 'সব পেয়েছির দেশে এসে পৌঁছে গেছি। সেখানে দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, শুধুই আনন্দ আর সুখের হাট। তারপর রাত নেমে এলে তুমি আমার মাথার কাছে বসলে, তোমার হাতটি ধরে আমি নরম বিছানায় আরাম করে ঘুমিয়ে পড়লুম। --বৃদ্ধা চুপ করেন। রাতের আসরে ঝিল্লির সরব ঝংকার প্রকৃতির আঙ্গিনায় সুরের সভা বসিয়েছে। জানলার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে আসা চাঁদের আলোর আপনা ঘরের মেঝেতে। সদ্য ফোটা হাসুহানার গন্ধ রাতের গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। রাত জাগা কোনোও অজানা পাখী, টিটুর-টিটুর শব্দ করে উড়ে যেতে থাকে। মৌ ধীরে ধীরে কোল থেকে মাথা তুলে বলে --তারপর? বৃদ্ধা বলেন তারপর আর কি— "আমার স্বপ্নটি ফুরোলো, নটে গাছটি মুড়োলো!!

মৌ বলে—জানো মিনি, তোমার স্বপ্নটা কিন্তু সেই ছোট্ট বেলায় শোনা রূপকথার মতো। সত্যি নয়, তবু যেন সত্যি, অনেক বার শোনা তবু নতুন। তোমাকে কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আছে, করবো? বৃদ্ধার নরম হাসি শোনা যায়, বলেন,–তা করো, শুনি, তারপর দেখি উত্তর দিতে পারি - আচ্ছা বলোতো, অমন জমকালো সদর দেউড়ি থাকতে, তুমি খিড়কি দিয়ে এলে কেন?–বৃদ্ধা উত্তর দেন –ওমা, মৌ কি বলে, বুদ্ধি-শুদ্ধির কি হোলো? এই পেঁজা পুরোনো কাপড় পরে সদর দিয়ে ঢুকে, মৌ কোথায়, মৌ কোথায় বলে ডাকাডাকি করলে তারা কি ভাবতো ? শেষে তোমায় এসে বলতো, ওগো মৌ এসো দেখে যাও, এই আদ্দিকালের বুড়ি, যার কাপড় চোপড়ের এই ছিরি, সেই হোলো তোমার নিজের লোক? কি আশ্চর্যি!! কি আশ্চর্যি!! বলতো না? তুমি পড়তে লজ্জায়। তা কি হতে দিতে পারি? তাই তো খিড়কি দরজা দিয়ে গেছি, কেউ যাতে আমাকে চিনতে না পারে।

মৌ এর মনে বৃদ্ধার সহজ কথাগুলো সজোরে নাড়া দিলো। সে এই প্রথম উপলব্ধি করলো, তার এই চিরকালের চেনা মানুষটিকে সে ভালো করে চেনেনা। চির উপেক্ষিতা আর অবহেলিতা এই মানুষটি ব্যস্তসংসারের ভিড়ের মাঝখানে, নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন, থেকেছেন সবার চোখের আড়ালে। তাঁর জীবনের যে কোনো দাম থাকতে পারে এমন কথা কেউ কোনদিন ভাবেনি, তিনি নিজেও না। জীবনের দাবী আছে বলে নয়, শুধু বাঁচবার প্রয়োজনে যখন যা পেয়েছেন তাই নিয়েছেন, অবমাননার সংগে বোঝাপড়া করে চলেছেন, বয়ে চলেছেন অজ্ঞাতির রিক্ততা । “আমার” বলে তাঁর কখনও কিছু ছিল না, না ঘর, না স্বামী, না সন্তান। যারা নিজের নয়, তাদের প্রতি তাঁর উৎসারিত স্নেহ প্রবাহিত হয়েছে অতৃপ্ত মাতৃহৃদয়ের স্বাভাবিক নিয়মে কিন্তু সেই স্নেহধারা কে সম্মান দিতে 'মা' বলে তাঁকে কেউ ডাকেনি। ভরা সংসারের হাটে তিনি নিতান্তই একা। তাই বুঝি তাঁর স্বপ্ন ‘সব পেয়েছির দেশের ? সেখানে তিনি ব্যথার অসীম পথ পেরিয়ে এসেছেন, ঐ খানে তাঁর নিমন্ত্রন এক রূপকথার মহলে। অনেক দিনের অনাদরের সাজটি ছেড়েছেন, নিজেকে দেখেছেন নতুন আবরনে। তুচ্ছতার প্রাচীর পেরিয়ে, মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন সবার মাঝে একজন হয়ে। কাজে অকাজে ‘কুনি' নামে যে মানুষটি সাড়া দিত সে হারিয়ে গেছে, স্বপ্নের কুহেলীর মধ্যে জেগে উঠেছে, কুন্দনন্দিনী। সেদিনকার সেই সন্ধ্যার আঁচল ছোঁওয়া, আসন্ন রাতের আকাশে, লক্ষ তারার মধ্যে ছড়িয়ে রইল একটি ক্লান্তিময়, বৈচিত্রহীন, ব্যর্থ জীবনের স্বপ্ন। সাক্ষী রইল শুধু অসম দু'টি মানুষ, যাদের মধ্যে কোনোও মিল পাওয়া কঠিন, শুধু এক অদৃশ্য ভালবাসার মিল ছাড়া।

মিনি পরিশিষ্ট --1
অনেক বছর পরে--
আমি মৌ।
আমার স্বপ্ন সফল করতে, প্রথমে বম্বে তারপর দেশে ছেড়ে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে এসেছি আমেরিকায়। পড়াশোনা শেষ হয়েছে। সময় বয়ে গেছে। দূর থেকে খবর পেয়েছি, মিনি চলে গেছেন, সেই ছোট্ট ঘরের গন্ডী ছেড়ে, ধরা ছোঁয়ার বাইরে এক অন্য লোকে। তাঁর অকিঞ্চিৎকর অস্তিত্ব পুরোপুরি ম্লান হয়ে ফুরিয়ে যাবার আগে, হয়তো কারো মনে একটু খানি ব্যথার ঢেউ তুলে ছিল, হয়তো কয়েক বিন্দু অশ্রু জমেছিল কারো চোখের কোনে। তারপর তাঁর স্মৃতি আবছা হতে হতে প্রায় মুছেই গেছে স্মৃতির

পাতা থেকে। তারপর তাঁর স্মৃতি আবছা হতে হতে প্রায় মুছেই গেছে স্মৃতির পাতা থেকে। সকাল থেকে রাতের নানা কাজ আর অকাজের ব্যস্ততার ঠাসবুনুনির জীবন যাত্রার এই নিরন্তর গতি, প্রতিটি দিনের গতানুগতিক পদক্ষেপ, আমাকেও নিয়ে গেছে বিগতকে পিছনে ফেলে, আগামীর উদ্দেশে। একদিন কুল ছেড়ে মাঝদরিয়ায় ভেসেছিলাম, যাত্রা শুরু করেছিলাম অজানার খোঁজে।। তারপর এক ভোরের আলোয় আমার তরী থেমেছে আরেক পারে। জীবনের নতুন সরিকেরা ভরে তুলেছে আমার দিন রাত্রি, হয়েছে নতুন পাতায় নতুন কাহিনীর সুত্রপাত। মনের এ্যালবামে, যা ছিল কাছের, যা ছিল চেনা, তা ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে এসেছে। পাতা ভরে উঠেছে আরো কত নতুন ছবিতে।

এক দিন সারাদিনের কাজের বোঝা নামিয়ে রেখে বসেছিলাম জানলার কাছে। অস্তরবির আলো ক্ষীন হতে হতে মুছে গেছে, ঘোমটার আড়ালে মুখ ঢেকে নামছিল রাত। কেন জানিনা, হঠাৎ আমার মনে পড়ে গিয়েছিল বহুদিন আগেকার আরেকটি সন্ধ্যার কথা। যদিও দুই সন্ধ্যার মধ্যে মিল তেমন পাওয়া ছিলনা। কাঁচের জানলায় আবদ্ধ বাতাতপ নিয়ন্ত্রত ঘরে আসেনা উড়ন্ত পাখির ডানার শব্দ, এ বিদেশে বাজেনা আরতির শাঁখ, তবুও আকাশে দিগন্ত সীমায় দেখা দেয় চতুদর্শীর চাঁদ। ধীরে ধীরে তার আলো ছড়িয়ে পড়ে ওক গাছের ডাল ছুঁয়ে আল্পনা হয়ে ধরনীর প্রাঙ্গনে। মনে পড়েছিল, এমনি শান্ত এক আসন্ন রাতের সন্ধিক্ষনে আমি শুনেছিলাম একটি গল্প। অনেক নিরাশা আর আত্মঅবমাননার ওপর স্বপ্নের আবরন দিতে চাওয়া এক ক্ষীন প্রয়াস। সেই মানুষটি সেদিন অন্ধকার ঘরে আমাকে শুনিয়েছিল তার মনের একটি ছোট্ট আবেদন –"আমি আসবো তোমার কাছে"। সে স্বপ্নে ছিল এক মনের আকুতি দিয়ে গড়া এক রূপকথার মহল। সুরক্ষিত তার দেউড়ি, লোক জন গিসগিস করছে দালানে, ঘরের পর ঘরে। সেই মহলে সে আসতে চেয়েছিল সংকোচের দীনতা নিয়ে, মনের কোনে লুকিয়ে রাখা আশা ছিল বিড়কি দরজা দিয়ে এলেও সে নতুন হয়ে উঠবে সাদর আহ্বানে, তাকে সবাই জানবে নতুন পরিচয়ে। এক মুহূর্তের জন্যে মনে হয়েছিল,- কে জানে মিনি কোথায় গেল? --

সেই রকমই, আর এক সন্ধ্যায় আমার কোলে ছিল শিশিরে ধোওয়া এক রাশ অপরাজিতা ফুলের মতো, আমাদের মেয়ে। নরম কালো চুল তার ছোট্ট মুখটি ঘিরে ছিল। তার ঘুম জড়ানো দীর্ঘপক্ষ সুন্দর গভীর দুটি কালো চোখ তুলে সে একটুক্ষন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। সে চোখে যেন চেনা কোন বিগত দিনের কাহিনী ছিল লেখো। মিনি স্বপ্ন দেখেছিল আমার কাছে আসবে। মহল নয়, দেউড়ি, খিড়কি নেই, লোক জন গিসগিস করছে না তবু আমার স্বপ্নের আশা, আনন্দ দিয়ে গড়া ঘর ভালবাসার আলোয় উজ্জ্বল। অবাস্তব এক মুহূর্তে মনে হয়েছিল, এতদিন পরে পথটি চিনে নতুন হয়ে, নতুন সাজে, আমার সেই পুরোনো মিনি আমার ঘরে আমার কাছে এসেছে? নির্জন নিঃশব্দ রেশমী নরম অন্ধকারে আমার কানে বাজতে উঠেছিল বহুদিন আগে শোনা এক বৃদ্ধার ক্ষীন কন্ঠস্বর, -- "আমি সব পেয়েছির দেশে এসে পৌঁছে গেছি। সেখানে দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, শুধুই আনন্দ আর সুখের হাট! কোলের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম ছোট্ট আমার মেয়ের কচি মুখটি ঘুমের মধ্যে কি এক স্বপ্ন দেখে নিঃস্পাপ হাসিতে উজ্জ্বল। বুকের কাছে টেনে নিয়ে তার কানে কানে বলেছিলাম,- -" মাগো, তুমি কে তা জানিনা, তবে তুমি যে

আমারই, সেই আমার পরম পাওয়া। তোমাকে যেন আমি চিরদিন আনন্দ আর সুখের দোলায় দুলতে, খেলতে দেখি।” কেন যেন আমার মনে হয়ে ছিল আমার আর মিনির স্বপ্ন সেদিন এক হয়ে গিয়েছিল।

মনের নিভৃতে হঠাৎ এই প্রশ্ন ভেসে উঠতে নিজেই চমকে উঠলাম। চিরকাল বাস্তববাদী আমার মনে একি অবান্তর চিন্তা? যুক্তি নেই, প্রমান দিয়ে উপলব্ধি করবার প্রশ্নই ওঠেনা এমন কথা ভাবনাতে এলোই বা কেমন করে? কবে কোন এক প্রহরশেষের বিষয় ক্ষণে শোনা অতৃপ্ত সঙ্গী বিহীন জীবনের, এক একটু চাওয়ার নিষ্ফল আশা, তাকে কি প্রলাপ বলে উড়িয়ে দেওয়াই সঙ্গত নয়? জীবনে, স্বপ্নের মানে খুঁজে কাটিয়ে দেওয়া নেহাৎ অবুঝের লক্ষন সে কথা কারই বা অজানা ?
আমার শিশু কন্যার ছোট্ট মাথাটি বুকে চেপে নিয়ে মনে মনে প্রশ্ন করলাম- মাগো, তুমি কে? উত্তরে সে আমার দিকে চেয়ে, সদ্য ফোটা শ্বেত কমলের মত শুভ্র হাসি ছড়িয়ে দিলো। বাইরে তাকিয়ে দেখলাম, তার হাসির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চাঁদের আলো পৃথিবীর মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। অর্থ বিহীন একটি ভাবনা আমার মনে ঢেউ তুলতে লাগলো, স্বপ্ন কি কখনো সত্যি হয়? হয়না যে তা ও কি সত্যি?

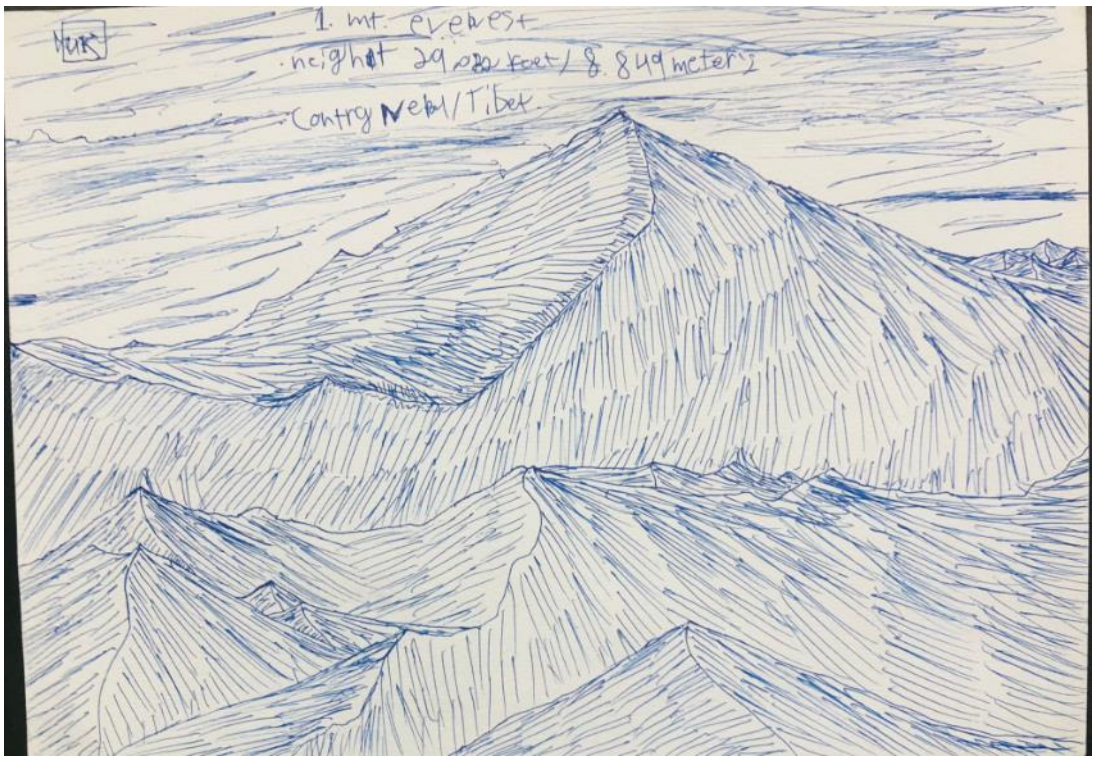

Mt Everest Aharshi Das
(3rd Grade)

আলু পোস্ত

সুদীপ সরকার

সঞ্জীবের সামনে দাঁড়িয়ে কোয়েল বললে
– এইযে শোনো আমার একটা কুকুর চাইই চাই।
নাকের ডগায় চশমা ঝুলিয়ে খবরের কাগজে ক্রসওয়ার্ড করছিলো সঞ্জীব।
– ও আচ্ছা বলে আবার ক্রসবোর্ডের দিকে মনোযোগ দিলো।
– কাগজটা কিন্তু এবার ছিঁড়ে দেব, যখনি দেখো কাগজের মধ্যের ঢুকে আছে। কি বললাম শুনেও শুনলে না.
– সব শুনেছি। তোমার কুকুর চাই।
নাকের ডগা থেকে চশমা নামিয়ে কোয়েলের দিকে তাকালো।
– শুধু শুনলে হবে? কোনো উচ্চ বাচ্চ করছো না যে
– এই তো সবে বললে, একটু ভাববার সময় টুকুও কি দেবেনা ? বলি মানুষেরও প্রসেসিং টাইম থাকে।
সঞ্জীব মাথা চুলকে, খবরের কাগজটি পাট করে কোলের ওপরে রেখে জিজ্ঞেস করল।
– কি কুকুর নেবে ঠিক করেছো ?
– Alsatian !
-সেকি! ও তো বিশাল বড় কুকুর। সামলাতে পারবে?
– কেন না সামলানোর কি আছে, সব্বাই তো রাখে। আমাদের পাড়াতে কজনের কাছে কুকুর আছে তুমি জানো?
– কি জানি, আমাদের বাড়িতে নেই এটাই নিশ্চিন্তি। যত সব ঝামেলা! সঞ্জীব আবার খবরের কাগজটি ঝেড়ে নিয়ে খুললো
– ঝামেলা! ঝামেলা আবার কিসের, খাবেদাবে মহা আনন্দে লেজ নাড়িয়ে থাকবে।
কোয়েল কোমরে হাত দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো।
– বাহ্! খালি input দেখলে হবে, output এর খেয়াল কে রাখবে? বলি output কে পরিষ্কার করবে। আমি নেই এইসবের মধ্যে।
– কেন, কানাই সকাল সন্ধে নিয়ে যাবে রাস্তায় , কোয়েল একটু ভেবে নিয়ে বললে
– আরে কানাইয়ের অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। কুকুরের টানের দায়ে হাত কাঁধ থেকে আলাদা হয়ে যাবে। হাতে ব্যাথা নিয়ে কি বাড়ির অন্যান্য কাজ করতে পারবে?
সঞ্জীব আর কোয়েল সল্ট লেকের বাসিন্দা। বিয়ের ২০ বছর হলো। মেয়ে প্রিয়াঙ্কা, সবে কলেজ যাচ্ছে। B.Com পড়ছে , graduation পর M .Com আর তারপর Chartered accountancy পড়বে বলে ঠিক করেছে। আজকাল বাচ্ছারা পুরো ক্যারিয়ার চার্ট আগেই তৈরী করে নেয়ে। না করেও উপায় নেই, যা competition । ইদানিং মেয়ে মায়ের মধ্যে বেশি কথোপকথন হয় না। মেয়ে তো কলেজ আর বাড়ি করে। রবিবার ও খালি রাখে নিজের জন্য।কোয়েল তাই বেশ কয়েক দিন ধরে ভাবছিলো একটা কুকুর নিয়ে আসবে। সামনের বাড়ির মুখার্জিরাও একটা কুকুর নিয়ে এলো। এক্কেবারে বাচ্চা ল্যাব্রাডোর। সেই দেখে কোয়েলের ইচ্ছে কুকুর পুষবে।
– না, আমার Alsatian চাইই চাই। আজকাল ভয়ানক চুরি হচ্ছে, একজন দাপটওয়ালা

কুকুর বাড়িতে থাকলে ভালো হয়ে, কোয়েল একটু ভেবে নিয়ে বললো।
– তুমি জানো Alsatian এর খরচ কত? একটা মানুষের খাওয়া। তার ওপরে ডাক্তার , ওষুধ পত্র লেগেই থাকে। সঞ্জীব একটু ভেবে বললে।
– তুমি ওই সারা জীবন টাকা গুনতেই থাকো। যাই বলি, তাতেই 'টাকা টাকা'. বলি এতো টাকা নিয়ে হবেটা কি ?
–দু পেয়েদের বাড়িতে চারপেয়ে থাকবে কি করে ? সঞ্জীব আড়চোখে একবার কোয়েলের দিকে তাকালো।
– তুমি যেমন আছো ও তেমনই থাকবে।
– হাঁ, এই আমার জীবন। সঞ্জীব একটা কৃত্রিম দীর্ঘ নিশ্বাস ফললো।
– বাজে কথা না বলে, যেটা বলছি সেটার বিষয়ে কিছু বোলো না।
–বলি, alsatian না নিয়ে রাস্তা থেকে একটা নেড়ির বাচ্চা নিয়ে এলে কেমন হয়ে। দেখতে কিন্তু বেশ cute হয়ে।
– না! তোমার স্ট্যান্ডার্ড কি নেড়ির ?
– স্ট্যান্ডার্ড! বাচ্ছা নেড়ি দারুন দেখতে হয়ে। ভালো খেতে দিলে ব্যানার্জীদের কুকুর থেকে ভালো দেখতে হবে। কেনার পয়সাও লাগবে না।
– আবার পয়সার কথা তুলছো?
সঞ্জীব হাত তুলে স্বীকার করলো এবং কোয়েলকে একটু চায়ের জন্য আবদার করলো। কোয়েলের সাথে সাথে রান্না ঘরে গিয়ে আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করলো।
– হমমম ! কুকুরের potty করানোর দায়িত্ব কার? আমেরিকায় বাড়ির কুকুর রাস্তায় potty করলে মালিককে তুলে পরিষ্কার করতে হয়। এই বয়সে তুমি আমাকে দিয়ে রাস্তায় কুকুরের potty তোলাবে ?
– বয়সের সাথে দেখছি তোমার একটু একটু ডিমেনশিয়া দেখা দিয়েছে। ভুলেই গেছো যে তুমি কলকাতায় থাকো। কুকুর রাস্তায় potty করবে আর সেই potty সকাল বেলা ঝাড়ুওয়ালা পরিষ্কার করে দেবে। আমি না হয়ে ওকে কিছু পয়সা দিয়ে দেব।
– চিন্তা করে দেখো বাঙালি বাড়ি, কুকুর রাস্তায় potty করবে আর বাড়ির ভেতরে এসে সোফায় বসবে।এটা তুমি মেনে নিতে পারবে?
কোয়েল কোমরে হাত দিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে বললো
– আর কিছু? শোনো সারা দিন বসে থাকো, কুকুর এলে একটু এক্সারসাইজ হবে তোমার। কিছু দিন পরে তো কোমরে প্যান্ট ফিট হবে না। পাজামার ওপরে শার্ট পরে অফিস যেতে হবে.
– তা অব্যশই সত্য বচন
ভুঁড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে সঞ্জীব বললো।
ওদের পাড়ার ব্যানার্জী বাবু রোজ কুকুর নিয়ে সকাল বেলা বেরোন। সঞ্জীবের সাথে একটু আদায়ে কাঁচকলার সম্বন্ধ ব্যানার্জী বাবুর। একদিন সকাল বেলা লেক থেকে ফেরার পথে ব্যানার্জী বাবু সঙ্গে সঞ্জীবের দেখা। সঞ্জীব দেঁতো হাঁসি হেঁসে বলেছিলো "Good morning, কেমন আছেন?" । ব্যানার্জী বাবুর মাঝে মাঝে রামকৃষ্ণ ভাব জেগে ওঠে। উনি সঞ্জীবের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন "কার কথা জিজ্ঞেস করছেন, আমি, না আমার ভেতরের আমি?" সঞ্জীব ও ফুল টস বলে ছক্কা মেরেছিলো। "আপনার ভেতরের আপনি আর আপনার নারী ভুঁড়ি সর্বস্ব মানে গোটা প্যাকেজ কে জিজ্ঞেস করছি?" ব্যানার্জী বাবু তাতে একটা হুম বলে এগিয়ে গিয়েছিলেন। সঞ্জীব আবার ফুট কেটে

বলেছিলো "কুকুরের বড় কাজ হয়ে গেলে আমাদের বাড়ি আসবেন এক সাথে চা খাওয়া যাবে"

এই কয়েকদিন আগের কথা, ব্যানার্জী বাবু সিগেরেট ফুঁকতে ফুঁকতে কুকুর নিয়ে হাঁটছিলেন। সবে একটা জম্পেশ সুখটান দিয়েছিলেন, হটাৎ একটা বেড়াল দেখে কুকর হেঁচকা টান মারলো। সেই নিশ্বাস আটকের বুক চেপে রাস্তায় বসে পড়েছিলেন। পাড়ার মুটে ওনাকে দেখে কোনো রকমে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলো।

এই ব্যানার্জী বাবু সাথে সকাল সকাল কুকুরকেpotty করানোর ইচ্ছে সঞ্জীবের একদম নেই।

–তা alsatian ব্রীড কি ফিক্সড? না অন্য কোনো ব্রীড রিসার্চ করে দেখবে?

সঞ্জীবের ছোটবেলায় কুকুরের সঙ্গে ছিল। ওদের বাড়িতে ভিশাল বড় কালো রঙের German Shepard ছিল নাম লালি । সঞ্জীবের প্রাণের বন্ধু। ওর সব দেখা শোনা সঞ্জীব করতো এটা বলা ঠিক হবেনা , বরং লালি সারাক্ষন সঞ্জীব এর সঙ্গে থাকতো। স্কুল যাওয়ার থেকে ফেরত আসার পর্যন্ত দরজার কাছে বসে থাকতো। সঞ্জীব তখন কলেজে পড়ে , লালির অনেক বয়েস। লালি চলে যাবার পর সঞ্জীব খুব মুষড়ে পড়েছিল এবং ঠিক করেছিল আর কোনো দিন বাড়িতে কুকুর আসবে না। তাই অনেক চেষ্টা করে যাচ্ছিলো কোয়েলকে কুকুর নেবার থেকে আটকানোর জন্য।

– আমি একটা গল্পের বইতে পড়েছিলাম, যে বাড়িতে যা কুকুর পোষা হয়, ওই বাড়ির লোকেদের ওই রকম দেখতে হয়ে যায়। এই যেমন ধরো যাদের বাড়িতে Golden retreiver থাকে তারা সারাক্ষন হাঁসি মুখে ঘুরে বেড়ায়। যাদের বাড়িতে চিহুয়াহুয়া আছে তারা সারাক্ষন খেঁক খেঁক করে আর যাদের বাড়িতে alsatian থাকে তারা সারা দিন গম্ভীর মুখ করে ঘুরে বেড়ায়।

– তুমি থামবে, তোমার মধ্যেও একটু গাম্ভীর্য দরকার, দিনদিন চেংড়ামো বাড়ছে , তাই আমার Alsation চাই

কোয়েল এতো বার করে বলছে, সঞ্জীবের কিন্তু ভেতর থেকে ইচ্ছে আছে তাই বললে

– ঠিক আছে, নিয়ে এস এখন, কি নাম ঠিক করলে।

কোয়েল এক গাল হেঁসে একটু ভেবে নিয়ে বললো – আলুপোস্ত!

– বাহ্! বেশ বাঙালিয়ানা নাম। তবে!!!!

নিজের ভুঁড়ি হাত বোলাতে বোলাতে সঞ্জীব বললো – আলুটা সরিয়ে দাও, খালি পোস্ত নামটি খাসা।

দুজনে হাঁসি হাঁসি মুখের নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলো।

WORLD FINANCIAL GROUP

Life/Visitors Insurance?

Estate planning? Long term Care?

One stop shop for all your financial questions.
Call today for quotes/questions!

ASHUTOSH SHYAM
5157085545

NOW SERVING College Prep solution powered by Kyros™

www.ozoneinsurance.com

Services offered

- **Holistic Financial Planning**
- **24/7 Notary Service**
- **Wealth Management**
- **Auto/Home/Life/Visitor's Insurance**
- **Financial Education**

Actively looking for new hires

Maa Durga - Mithu Deb

বৃক্ষরোপণ

সুস্মিতা সেন

আজ থেকে প্রায় পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন বছর আগেকার কথা বলছি। আমরা তখন কলকাতা শহরেই থাকতাম। কিন্তু খাস কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে নয়। বরং শহরের প্রান্তবর্তী এলাকায় বাস রাস্তা থেকে একটু ভিতরে ইতস্ততঃ ছড়ানো পুকুর আর গাছপালা মাঠঘাট সুলভ এক পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তু পাড়ায় ছিল আমাদের বাড়ি। পাঁচ কাঠা জমির এক অংশে চুন সুরকি দিয়ে গাঁথা ইটের দেয়ালের উপরে টিনের চাল দিয়ে ছাওয়া ছিল আমাদের বাড়ি। বাড়ির সামনে অনেকটা জমি জুড়ে ছিল নানা ধরনের গাছপালা। সামনে ফুলের বাগান আর তারপরে অনেক ফলের গাছ। আম, জাম, কাঠাল, জামরুল, আতা, কলাগাছের ঝাড়। আর জমির সীমানায় সারি দেওয়া সুপারি গাছ। কিন্তু কোনো নারকেল গাছ ছিল না। অনেকবার রথের মেলা থেকে নারকেল গাছের চারা কিনে এনে দাদু জমির চার কোণায় লাগিয়েছিল। কিন্তু কেন জানি না কোনো নারকেল গাছই বাঁচত না। আমার সবচেয়ে প্রিয় ছিল অনেক ডালপালা মেলা একটা বড় টগর গাছ। যেটাতে সারা বছর সাদা ফুল ফুটত। আর ফুল বাগিচার মাঝখানে ছিল একটা শিউলি গাছ। দুর্গাপূজার আগে থেকেই রোজ সকালে গাছটা ভরে থাকত অজস্র শিউলি ফুলে। আর গাছের তলায় সবুজ ঘাসের উপরে সাদা আর কমলা নকশার গালিচা তৈরি হতো। আমরা রোজ সকালে সাজি ভরে ফুল তুলতাম। ঠাকুমা সেই ফুল দিয়ে ঠাকুরের আসনের সামনে ফুলের আলপনা দিত। শিউলি ফুলের মিষ্টি গন্ধে সারাদিন ঠাকুর ভরে থাকত। আর ছিল একটা সাদা গন্ধরাজ আর একটা স্থলপদ্মের গাছ। স্থলপদ্মের গাছে সকালে অনেক সাদা রঙের স্থলপদ্ম ফুটে থাকত। আর বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুলগুলো ক্রমশ রং বদলে গোলাপি হয়ে যেত। এইরকম সুন্দর বাগান পাড়ায় তখন আর কারো বাড়িতে ছিল না। বাগানের পরিচর্যা করত আমার দাদু।

আমাদের বাড়িতে তখন অনেক লোক ছিল। দাদু, ঠাকুমা, বাবা, মা, তিন কাকা, তিন পিসি আমরা ভাইবোনেরা আর দেশের বাড়ি থেকে আসা দাদুর এক জ্ঞাতি ভাইপো, শান্ত শিষ্ট সুবোধকাকা। সেই সময় বড় কাকা সবে চাকরীতে ঢুকেছে।অন্য কাকা পিসিরা স্থানীয় ছেলেদের আর মেয়েদের স্কুলে পড়ত। আমি তখন পাড়ার নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেনীতে পড়ি। বয়স আট নয় বছর হবে। সেই সময় ওই অঞ্চলে বিদ্যুতের আলো পৌঁছায় নি। রোজ বিকালে মাকে দেখতাম চার পাঁচটা হ্যারিকেনের কাচের চিমনিগুলো উনুনের শুকনো ছাই আর ন্যাকড়া দিয়ে পরিষ্কার করে, কেরোসিন তেল, ভরে সাজিয়ে রাখত। আমরা সন্ধ্যের ঠিক আগেই মাঠ থেকে খেলা শেষ করে বাড়িতে ঢুকলেই ঠাকুমা হ্যারিকেনগুলো জ্বেলে দিত।

তখন বিকাল হলেই মাঠে খেলতে যাওয়া অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ছিল। তখন স্কুলের পরে এত কোচিং ক্লাস বা টিউশন পড়ার চল ছিল না। বিকালবেলা খেলতে না গেলেই বড়দের কাছে বকা খেতাম। আমরা অপেক্ষা করে থাকতাম খেলার সময়ের জন্য। আমাদের কত রকমের খেলা ছিল আর খেলার মাঠও ছিল। মাঠে কোর্ট কেটে হাডুডু,

দাঁড়িয়াবান্ধা, বা বুড়িবাসন্তী, রুমালচোর, খো খো খেল। খেলোয়ার কম থাকলে মজার হুশ হুশ খেলা হত। এই খেলাতে একজন চোর হয়ে পিছন ফিরে একশ গুনত আর সেই ফাঁকে বাকি খেলোয়াড়রা লুকিয়ে পড়ত। গোণা শেষ হলে চোর লুকিয়ে থাকা বন্ধুদের খুঁজত। আর কাউকে দেখতে পেলেই তার নাম ডেকে 'হুশ' বললেই সেই বন্ধু আউট। লুকানো জায়গা থেকে চুপিচুপি বেড়িয়ে এসে কেউ যদি চোরের পিঠে কিল মেরে 'ধাপ্পা' বলতে পারত তবে চোরকে আবার একশ গুনতে যেতে হত।

সন্ধ্যাবেলায় সব ঘরের মাঝখানের বারান্দায় একটা হ্যারিকেনের চারপাশে আমরা স্কুলপড়ুয়ারা উচ্চৈস্বরে বিভিন্ন বিষয়ের পড়া মুখস্ত করতাম। তাতে আমাদের কারো পড়াশুনায় ব্যাঘাত হচ্ছে বলে কোন অভিযোগ ছিল না। কলেজে পড়ুয়া পিসিমনি রোজ সন্ধ্যাবেলা সা রে গা মা পা করে এক ঘন্টা ধরে গলা সাধত। ঠাকুরঘরে ঠাকুমার তিন বার শঙ্খধ্বনি আর তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালানো দিয়ে আমাদের স্বায়ংকালীন বিদ্যাচর্চা শুরু হত। তখন জোরে জোরে পড়া করতে হত যাতে বড়দের কানে যায়। কারো পড়া বন্ধ হলেই রান্নাঘর থেকে মার গলা শোনা যেত, 'কিরে গবু তোর পড়া শুনি না ক্যান?' ছোটকাকা উত্তর দিত, 'না বৌদি চুপ কইরা পড়াটাই ভাবতাছি।' বলাই বাহুল্য যে পড়ার চাইতে চোখ বুজে পড়া ভাবতেই ছোটকাকার অধিকাংশ সময় ব্যায় হত।

সেই দিনটা ছিল এপ্রিল মাসের শেষের এক রবিবার। আমাদের বিকালের খেলা বন্ধ করে রোজ বিকালে স্বপনদাদের বাড়িতে রবীন্দ্রজয়ন্তীর রিহার্সাল চলছিল। সেবারে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটক মঞ্চস্থ করা হবে ঠিক হয়েছিল। নাটকে আমি দইওয়ালা, ছোটপিসি ছোট্ট নায়ক অমল, ফুলপিসি গ্রামের মোড়ল, জোছনাদি অমলের পিসামশাই আর নাটকের পরিচালক ছিল সদ্য কলেজে ঢোকা স্বপনদা। সেদিন দুপুর তিনটে থেকেই স্বপনদার কড়া শাসনে আমাদের রিহার্সাল শুরু হয়েছিল আর বিকাল পাঁচটা নাগাদ স্বপনদাদের বাইরর বারান্দায় বড়দের দাবা খেলা শুরু হল। আমার দাদু, স্বপনদার বাবা, কেয়ার দাদু আর শশীদাদু এই চারজন প্রথমে দুটো দলে খেলা শুরু করত। ক্রমে পাড়ার আরো দাদুরা এসে যার যার পছন্দের দল ভারী করত। আর সেই দাবা খেলায় এত হট্টগোল হত যা বাচ্চাদের খেলাতেও হতোনা। প্রতিটি চালের পরেই সবার হৈ হৈ করে ওঠা আর বিপক্ষ খেলোয়াড়ের উদ্দেশ্যে বলা খুব কমন বাক্য সবার কন্ঠেই শোনা যেত, 'যান যান আপনার গিন্নিরে গিয়া খেলা শেখান'।

সেদিনও এইরকম হৈ চৈ করে বারান্দায় দাবা খেলা আর ভিতরের হলঘরে নাটকের রিহার্সাল চলছিল। আমার পার্ট সবে শেষ হয়েছে, কিন্তু আমার অভিনয় স্বপনদার পছন্দ হচ্ছিল না। আমাকে বার বার শেখাচ্ছিল কি ভাবে সুর করে টেনে টেনে বলতে হবে – 'দ—ই----চা—ই---দ—ই---ভা—লো---দ—ই' আমার ঠিকমতো সুর হচ্ছিল না। শেষে রেগে গিয়ে স্বপনদা বললো, 'তুই যা রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সুর করে একশ বার বলবি, 'দ—ই---চা—ই---দ—ই---ভা—লো---দ--ই'। আমি মুখ চুন করে হলঘর থেকে বেড়িয়ে স্বপনদাদের রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সুর করে ঠিকভাবে পার্ট বলার চেষ্টা করতে লাগলাম। স্বপনদার মা রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত ছিল। আমাকে একা একা ওরকম সুর করে পার্ট মুখস্ত করতে দেখে হেসে বললেন, 'কি রে স্বপনদা শাস্তি

দিয়েছে তো? দাঁড়া আজকে স্বপনকে আমি খুব বকে দেবো। নে এই ডাবের জলটা খেয়ে ফেল তো। খুব ঘেমে গেছিস'। আমাকে এক গ্লাস ডাবের জল খেতে দিল জেঠিমা। আমার সত্যিই গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল। এক চুমুকে গ্লাসের জলটা শেষ করলাম। আমার জেঠিমাকে খুব ভালো লাগে। জেঠিমা একটা ঝুনো ডাব হাতে করে নিয়ে এসে আমাকে বললো, 'এটা নারকেল হয়ে শিষ বেড়িয়ে গেছে। এটা ঠাকুমাকে দিয়ে বলবি বাগানের দক্ষিণ-পূর্ব কোনে পুঁতে দিতে। খুব ভাল কেরালা জাতের নারকেল গাছ হবে'। আমি নারকেলটা জেঠিমার হাত থেকে নিয়ে রান্নাঘরের বাইরে এক কোনায় রেখে দিয়েছিলাম। জেঠিমা বললো, 'ভুলিস না কিন্তু। বাড়ি যাবার সময় মনে করে নিয়ে যাস।'। আমি আর কিছুক্ষণ পার্ট মুখস্ত করে স্বপনদার কাছে পড়া দিতে চলে গেছিলাম।
এরপর আমাদের রিহার্সাল আর দাবা খেলা সমান তালে চলছিল। আধ ঘন্টাও হয়নি হঠাৎ স্বপনদাদের রান্নাঘরে ঝন ঝন করে বাসন পড়ার আওয়াজ। স্বপনদা রান্নাঘরে দৌঁড়ে গেল। তারপরেই স্বপনদার চিৎকার, 'মা মা তোমার কি হল? কথা বলছ না কেন? বাবা শীগগীর এস। মা কথা বলছে না।

দাবা খেলা ফেলে জেঠামশাই ছুটলেন রান্নাঘরে। দেখি রান্নাঘরের মেঝেতে ছড়ানো বাসনের মধ্যে জেঠিমা চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে, আর স্বপনদা জেঠিমার মাথাটা কোলে নিয়ে 'মা চোখ খোলো, মা চোখ খোলো' বলে চিৎকার করছে। খুশিদাদু এসে জেঠিমার হাতের নাড়ি ধরে কিছুক্ষণ দেখে জেঠামশাইকে বললেন, 'ধীরেন, বৌমার নাড়ির গতি সুবিধার নয়, তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে চলো'।

সেইসময় পাড়াগুলো ছিল এক একটা বড় পরিবারের মতো। সবার সুখে, দুঃখে, সবাই পাশে থাকত। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বপনদাদের বাড়ির সামনে উৎকন্ঠিত মুখে প্রতিবেশীদের ভিড় জমতে লাগল। ইতিমধ্যে ট্যাক্সি চালায় পাড়ার গদাইকাকা ডাকার আগেই তার হলুদ কালো ট্যাক্সি নিয়ে চলে এল। ঠাকুমাকে দেখলাম ওই উত্তেজনার মধ্যেও খুব শান্তভাবে দাদুকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে দাদুর হাতে কিছু টাকা দিয়ে দিলো। ট্যাক্সির পিছনের সিটে জেঠামশাই আর স্বপনদার কোলে অচেতন জেঠিমাকে শুইয়ে আর সামনের সিটে দাদু আর শশীদাদুকে কষ্ট করে বসিয়ে গদাইকাকার ট্যাক্সি পি.জি. হাসপাতালে চলে গেল।

সবাই আমাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো জেঠিমার সঙ্গে আমার শেষ কি কথা হয়েছে। জেঠিমা তখন কেমন ছিল। অস্বাভাবিক কিছু লাগছিল কি না। শরীর খারাপের কথা কিছু বলেছিল কি না ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি সবাইকে একই উত্তর দিচ্ছিলাম যে জেঠিমা ভালো ছিল আর আমাকে এক গ্লাস ডাবের জল খেতে দিয়েছিল।

আমরা ডাকঘর নাটকের কুশীলবরা ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম। স্বপনদার ছোট ভাই তপনদা মায়ের খবর শুনে ফুটবল খেলা ফেলে বাড়ি চলে এসেছে। তপনদা ঘরের এক কোনায় দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। ঠাকুমা আমাদের বললো, 'কালবৈশাখী আসছে। সবাই তাড়াতাড়ি বাড়ি যাও। আমি এখানে তপনের কাছে থাকব'।
লক্ষ্য করিনি কখন আকাশটা খুব কালো হয়ে গেছিল। বাড়ি ফিরে হাত পা ধুতে না ধুতেই শুরু হল প্রচন্ড কালবৈশাখী। প্রায় এক ঘন্টা ধরে চলল ঝড়ের তান্ডব আর

শিলাবৃষ্টি। ঝড় থামলে আবার আকাশে বড় চাঁদ হেসে উঠল। মনে পড়ল সেদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা। পাড়ার বন্ধু কুমকুমদের বাড়ি সত্যনারায়ণ পূজার সিন্নি খাবার নিমন্ত্রণ ছিল। কুমকুমদের বাড়ির হ্যাজাকের আলো দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু সেদিন লোভনীয় সিন্নিতেও মন টানছিল না

বারান্দায় একটা হ্যারিকেন ঘিরে আমি, ছোটকাকা, ছোটপিসি আর ফুলপিসি পড়া করছিলাম। পিসিমনিও সেদিন গলা সাধতে বসেনি। আমি বারান্দার দেয়ালে পিঠ দিয়ে বাগানের দিকে মুখ করে বসেছিলাম। পড়াতে মন বসছিল না। বারবার বাগানের ওপাশে স্বপনদাদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে জেঠিমার কথা মনে হচ্ছিল।

সেই বারের গরমকালে খুব জলকষ্ট হয়েছিল। টিউবওয়েলে জল উঠছিল না। দাদু তাই বাগানের এক কোনায় একটা কূঁয়ো খোঁড়ার ব্যাবস্থা করেছিল। সেদিন সকাল থেকেই কূঁয়ো মিস্ত্রীরা গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে আর গর্তের ভিতরে গোল গোল মাটির বেড় বসিয়ে একটা গভীর কূঁয়ো খুঁড়ে ফেলেছিল। কাল কূঁয়োর পাশ সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো হবে। আর বাগানের দক্ষিণ-পূর্ব কোনায় কূঁয়ো খোঁড়ার মাটি জমা হয়ে ছোট একটা পাহাড়ের মতো হয়েছিল। সেদিন রাতে বাগানটাকে খুব অদ্ভুত লাগছিল। আকাশে চাঁদের আলো থাকলেও বাগানের গাছপালার মধ্য দিয়ে আবছা আলোই ঢুকছিল। বাগান জুড়ে কেমন মায়াবী আলো আঁধারির খেলা চলছিল।

হঠাৎ আমার নজর পড়ল ওই মাটির পাহাড়ের আড়ালে কে যেন বারবার মাথা ঝুঁকিয়ে কিছু করছে। ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বুঝবার চেষ্টা করছিলাম। মনে হলো মাথায় ঘোমটা দিয়ে কোনো মহিলা মাটির স্তূপের ওপাশে বারবার মাথা নিচু করে কোনো কাজ করছিল আবার মাথা উঁচু করে আমাদের বারান্দার দিকে দেখছিল। হঠাৎ করে আমার খুব ভয় করতে লাগল । সাহসী ছোটকাকাকে ডাকতে গিয়ে দেখলাম, ছোটকাকা দেয়ালে হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছে। ফুলপিসি সবচেয়ে ভীতু। ওকে বললে ও ভয়ে চিৎকার করে একটা কান্ড ঘটাবে। আর ছোটপিসি কখন চুপচাপ পড়া ছেড়ে রান্নাঘরে মার কাছে চলে গেছিল টের পাইনি। বেশ গা ছমছম করছিল করছিল। মাকে ডাকতে গিয়ে দেখি গলা দিয়ে আঁওয়াজ বার হচ্ছে না। পড়ার জায়গা ছেড়ে বাইরে রান্নাঘরে মার কাছে যাবার সাহস হচ্ছিল না। বাবা আর কাকাও বাড়ি নেই, ঝড় থামলে হাসপাতালে গেছে। ভয় করলেও ওই মাটির পাহাড় থেকে চোখ সরাতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল ওই মহিলা যেন বারবার নিচু হয়ে ইশারা করে আমাকে কিছু বোঝাতে চাইছিল। কতক্ষণ এভাবে সম্মোহিত হয়েছিলাম জানিনা। আচমকা একটা দমকা বাতাস ঘূর্ণিঝড়ের মতো আমাদের বাগানের উপর দিয়ে বয়ে গেলো। এক পলকের জন্য মনে হল মাটির পাহাড়ের কাছে ওই মহিলা আমাকে শেষবারের মতো হাত নেড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। আবার বৃষ্টি শুরু হলো।

আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করছিল। তক্ষুনি গেট খুলে দাদু বাড়ি ঢুকলো। মা রান্নাঘর থেকে দাদুর কাছে দৌঁড়ে এলো। দাদু একটা দীর্ঘ নিশ্বাসঃ ফেলে বললো, 'ধীরেনের বউএর স্ট্রোক হয়েছে বৌমা। ডাক্তাররা কিছু করতে পারলো না। রাত আটটা নাগাদ সব শেষ হয়ে গেলো'। মা শোকস্তব্ধ গলায় অস্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করলো, 'দিদি আর নেই'!

‘জেঠিমা আর নেই’ এই খবরটা যে কতটা ভয়ঙ্কর সত্যি সেটা অনুভব করার মতো বোধ আমার তখন তৈরি হয় নি। শুধু খুব মন খারাপ হয়ে গেছিল। সেদিন মা আমাদের তাড়াতাড়ি খাইয়ে শুতে পাঠিয়েছিল। বিছানায় শুয়ে ঘরের চালের উপর একটানা বৃষ্টি পড়ার শব্দ শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

পরদিন ঘুম ভাঙ্গলো এক রোদ ঝলমল সকালে। বাগানের অবস্থা লণ্ডভণ্ড হয়েছিল। একটা কলাগাছ উপড়ে পড়েছিল। বাগানময় ছড়ানো ছিল সুপুরি গাছের খোল। মাটির পাহাড় বৃষ্টির জলে ধুয়ে গিয়ে অনেকটা উষ্চতা হারিয়েছিল। সারা বাগান কর্দমাক্ত। দিনের উজ্জ্বল আলোয় আলোয় আগের রাত্রির অভিজ্ঞতা ভুলে গেছিলাম। যখন রাজমিস্ত্রীরা কূঁয়ো বাঁধাতে এল আর মাটির পাহাড়টা কেটে সমান করে মাটিটা ছড়িয়ে দিচ্ছিল তখন আবার আগের রাতের ঘটনাটা মনে পড়ল। দাদু আমার খুব বন্ধু। দাদুকে গিয়ে বললাম, ‘জানো দাদু, কাল রাত্তিরে একজন ঘোমটা দেওয়া বউ ওই মাটির পাহাড়ের ওপাশে নিচু হয়ে কি করছিল। আর আমাকে ইশারা করে ওই জায়গাটা দেখাচ্ছিল। মনে হল জেঠিমার মতো।

দাদু কিছুক্ষণ চুপ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ওই জায়গাটায় কি হয়েছে দেখতে গেল। দিনের বেলা বীরবিক্রমে দাদুর পিছনে পিছনে আমিও চললাম। গিয়ে দেখলাম ঠিক ওই জায়গাটায় একটা সুপুরি গাছের ডাল নরম মাটিতে কাত হয়ে গেঁথে আছে, আর পাশে মাটিতে কাদা মাখামাখি হয়ে আছে খুব চেনা জেঠিমার সেই নীল গামছা যেটা রোজ দুপুরবেলা স্নানের পরে জেঠিমা বাড়ির ছাতের দড়িতে মেলে দিত।

দাদু বললো, ‘ঝড়ের দাপটে সুপুরি গাছের ডাল ভেঙ্গে এখানে এসে পড়েছিল আর তার উপরেই ছাতের থেকে গামছাটা ঝড়ের হাওয়ায় উড়ে এসে পড়েছিল। সেটাকে রাতে তোমার মনে হয়েছিল ঘোমটা দেওয়া কোনো বউ। ভয় পাবার কিছু নেই। এরপরেও আমার মনটা খচ খচ করছিল। দাদু কি মনে করে শুধু ওই জায়গাটুকুর মাটি সরাতে মিস্ত্রীদের বারণ করল।

এর পরে প্রায় এক মাস কেটে গেছিল। সেই ঝড়ের রাতের কথা ভুলেই গেছিলাম। স্কুলে গরমের ছুটি চলছিল। আমাদের রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপনের দিন পিছিয়ে গিয়ে গতকাল হয়ে গেছে। স্বপনদা আবার আমাদের নিয়ে ‘ডাকঘর’ নাটকের রিহার্সাল করিয়েছিল। তবে স্বপনদা অনেক চুপচাপ হয়ে গেছিল। আগের মতো আমাদের অত বকাঝকা করত না। তবে এবার নাটকে আমার দইওয়ালার ডাকটা বেশ ভালো হয়েছিল বলে সবার প্রশংসা পাচ্ছিলাম। আমাদের নাটকের খুব প্রশংসা হয়েছিল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা মাঠের খেলা শেষ করে নতুন কূঁয়োতলায় হাতমুখ ধুচ্ছিলাম, হঠাৎ চোখে পড়ল জমে থাকা অবশিষ্ট মাটির স্তূপের উপরে একটা নতুন গাছ গজিয়েছে। আমার গাছপালার ব্যাপারে খুব উৎসাহ। কৌতূহলী হয়ে কাছে গিয়ে দেখি জমে থাকা মাটির স্তূপের তলা থেকে দুটো কচি নারকেল পাতা বেড়িয়ে এসেছে। আমাদের বাগানে একটাও নারকেল গাছ নেই। লাগালেও মরে যেত। হঠাৎ এই নারকেল চারাটা আপনা

আপনি কি করে এখানে গজালো বুঝতে পারছিলাম না। ঘরে গিয়ে দাদুকে ডেকে আনলাম। দাদুও খুব অবাক হয়ে আমার সঙ্গে নারকেল চারা দেখতে এল। খুব ভালো করে পরীক্ষা করে দাদু বললো, 'এটা তো খুব ভালো জাতের কেরালিয়ান নারকেল গাছ। এই জাতের গাছ এ পাড়ায় শুধু স্বপনদের বাগানেই একটা আছে। তবে এই গাছ আমাদের বাগানে কি করে এল'।

আমার মনে পড়ে গেল, এক মাস আগে জেঠিমা যেদিন মারা যায়, সেদিন বিকালবেলায় আমাকে একটা নারকেল দিয়ে আমাদের বাগানের দক্ষিণ পূর্ব কোনায় পুঁতে দিতে বলেছিল। কিন্তু আমি তো নারকেলটা জেঠিমার রান্নাঘরের বাইরে রেখে চলে এসেছিলাম। তারপরেই জেঠিমার অসুস্থ হওয়া, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া। নারকেলটার কথা ভুলেই গেছিলাম। এখন দেখছি আমাদের বাগানের ঠিক দক্ষিণ পূর্ব কোণে কূঁয়ো খোঁড়ার মাটির স্তূপের তলায় সেই নারকেলটা কেউ পুঁতে দিয়েছিল। এক মাস পরে সেটা থেকেই নতুন চারাগাছ বেড়িয়েছে। সেই ঝড়ের রাতে যে বউটিকে এখানে দেখেছিলাম নিশ্চই সেই পুঁতেছিল আর বারবার ইশারা করে আমাকে এই বৃক্ষরোপনের জায়গাটা দেখিয়ে রাখছিল।

আমি দাদুকে বললাম, 'দাদু, আমি জেঠিমার দেওয়া নারকেলটা ভুলে ফেলে এসেছিলাম বলে সেদিন ঝড়ের রাতে জেঠিমা নিজে এসে নারকেলটা এখানে পুঁতে দিয়ে গেছিল। আমি একটুও ভুল দেখিনি।ওটা মোটেও সুপুরি গাছের ডাল ছিল না নিশ্চই জেঠিমাই ছিল'।

দাদু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললো, 'বৌমা বলেছিল, নারকেল চারা হলে আমাকে একটা দেবে। বড় অসময়ে হঠাৎ করে চলে গেল। কিন্তু শরীর খারাপ হবার আগেই সেদিন বিকালবেলা কোন সময়ে এখানে এসে নারকেলটা পুঁতে দিয়ে গেছিল। কাউকে বলার সময় পায় নি। আর কূঁয়োর উর্বর মাটি পেয়ে গাছ বেড়িয়েছে। এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই'।

আমি জোর দিয়ে বললাম, 'তা কি করে হবে দাদু। পরে বাড়ি নিয়ে আসবো বলে আমি তো নারকেলটা রান্নাঘরের বাইরে সরিয়ে রেখেছিলাম। জেঠিমা তখন রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত ছিল। আমাদের বাগানেও আসেনি। আমার মনে হয় সেই রাত্রে আকাশের তারা হয়ে যাবার আগে জেঠিমা এখানে এসেছিল আর মাটির পাহাড়ের তলায় নারকেলটা পুঁতে দিয়ে গেছিল'।

দাদু এবার আমাকে থামিয়ে দিয়ে একটু গম্ভীর ভাবে বললো, 'শোনো, এই নারকেল গাছ কে বসিয়েছে সেটা নিয়ে তুমি বেশি মাথা ঘামিও না। আমি বলছি এটা সেদিন বিকালে বৌমাই এসে লাগিয়েছিল, তুমি খেয়াল কর নি। এটা নিয়ে আর কথা বলবে না। যাও ঘরে গিয়ে পড়তে বসো'।

আমার বিশ্বাস কিন্তু মনে দৃঢ় ভাবে গেঁথেই রইল। তারপর দাদুর যত্নে আর নতুন মাটির গুণে আমাদের প্রথম নারকেল গাছটা ঠিক বেঁচে গেল। বড় হল। গাছে প্রচুর নারকেল হত। এত বছর পরে এই ষাটোত্তীর্ণ বয়সেও আমার মনে হয় সেই ঝড়ের রাত্রে আমি স্পষ্টই জেঠিমাকে নারকেল গাছ লাগাতে দেখেছিলাম। সেই বৃক্ষরোপণ সম্পূর্ণ করেই জেঠিমা মুক্তি পেয়ে স্বর্গে গেছে। জেঠিমার রোপণ করা নারকেল গাছ এখনো আমাদের বাগানের এক কোনায় সদর্পে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

Mathews
CPA Inc.
www.mathewscpainc.com
1908 Yaupon Trl Suite 102
Cedar Park TX 78613
Tel: 512-980-1000
Fax: 512-528-5703
9415 Burnet Road Suite 107
Austin TX 78758
Tel: 512-710-1000
Fax: 512-528-5498
Mathews Chacko
Certified Public Accountant
IRS Acceptance Agent
512-980-1000
Email: mathews.chacko@mathewscpainc.com

আমার দেখা Loumarin

নন্দিতা সরকার

আমার ১০ বছরের জন্মদিনে একটা বই উপহার দিয়েছিলেন আমার মাসি। তখন আমাদের জন্মদিনের উপহারের তালিকায় থাকতো বই, পেন, বিভিন্ন রকমের বোর্ড গেম- তার সাথে একটা ,দুটো ক্যাডবেরি । বইটার নাম ছিল “বিশ্ব ভ্রমণ” ।সারা পৃথিবীর সব বিখ্যাত বিখ্যাত দর্শনীয় স্থানের ছবি দিয়ে সাজানো তার প্রচ্ছদ ।নায়াগ্রা ফলস ছিল ,চায়নার গ্রেট ওয়াল ছিল ,আর ছিল মিশরের পিরামিড। কিন্তু মাঝখানে জ্বলজ্বল করছিল লম্বা, উঁচু আইফেল টাওয়ার। যেটাকে এক নজরে চিনতে পেরেছিলাম ।কারণ আমাদের বসার ঘরের শোকেসে আইফেল টাওয়ারের ছোট্ট একটা রেপ্লিকা ছিল ।হাত পিছনে করা ,সাদা জোব্বা পড়া রবীন্দ্রনাথের পাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতো সবুজ রঙের সেই আইফেল টাওয়ারটা । বইটা হাতে পেয়েই সব পাতাগুলো চটপট উল্টিয়ে চলে এলাম সোজা ফ্রান্স ।ততদিনে ফ্রান্সের সাথে সাথে প্যারিস -এই নামটাও আমার জানা হয়ে গেছে ।আমার বাবা রফি সাহেবের মুগ্ধ ভক্ত ছিলেন ।"অ্যান্ ইভিনিং ইন প্যারিস" এই গানটা মাঝেমধ্যে গলা খুলে গাইতেন। সে কারণেই হয়তো প্যারিস নামটা মনে গেঁথে গেছিল। ।পাতা উল্টিয়ে তো ফ্রান্সে গিয়ে পড়লাম। কত রকমের খাবারের নাম জানলাম ।সে দেশের রকমারি চিজ, ব্রেড, সুপ আর শ্যাম্পেন নাকি অতুলনীয়।আরো সব অজানা নাম ।মনে হল এত খটোমটো নাম -এমন সব ছবি -নিশ্চয়ই খেতে ভালো হবে ।মার কাছে বায়না করলাম ।এগুলো রান্না করো । ছবিগুলো দেখে মা গম্ভীর মুখে বলল -এগুলো তো করতে পারব না ।তবে একটা ফরাসি খাবার তো মাঝে মাঝেই তোমাদের বানিয়ে দিই -ফ্রেঞ্চ টোস্ট। ডিমে ডুবিয়ে পাউরুটিকে ভেজে তোলা পদটির নাম ফ্রেঞ্চ টোস্ট। প্লেটের পাশে সঙ্গী থাকতো অল্প শসা কুচি আর পিঁয়াজের টুকরো। তখনো টমেটো কেচাপ বা সসের এত আধিপত্য হয়নি বাঙালির ঘরে ঘরে। পরে জেনেছিলাম ফ্রেঞ্চ টোস্ট আদতে কোন ফ্রেঞ্চ খাবারই নয় । আমেরিকানদের দেওয়া একটা নাম মাত্র।

এ হেন দেশটির প্রতি আমার খুবই আগ্রহ ছিল।কয়েকবার দেশে যাওয়ার পথে প্যারিস এয়ারপোর্ট ছুঁয়ে গেছি।কিন্তু সেভাবে দেশটাকে জানার মতো অভিজ্ঞতা আমার হয়নি ।এবছর সামারে যখন আমরা বেড়াতে যাবার প্ল্যান করছিলাম,ভাবলাম এবার ফ্রান্সে যাওয়া যাক ।কিন্তু কেন জানি সেই প্ল্যান টাও শেষমেষ টিকলো না। সবশেষে ঠিক হলো মেডিটারেনিয়ান ক্রুজ নেওয়া হবে বার্সেলোনা থেকে । আশার কথা হলো স্পেন এবং ইতালির সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের অল্প একটা ছোট্ট অংশ এবার দেখা যাবে। যেখানে আমরা যাব সেই ছোট্ট গ্রামটার নাম হলো Lourmarin. বাংলাতে এই নাম লেখার সাহস আমার নেই। সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারাটাও আমার পক্ষে দুঃসাধ্য । Lourmarin পরিচয় একটি মিডাইভাল ভিলেজ হিসেবে ।সময়ের সাথে সাথে হয়তো অনেকটাই বদলে গেছে ,তবুও স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা ভিলেজের ছবি এখনো খুঁজলে খুব সহজেই চোখে পড়বে । সেদিনটা ছিল মে মাসের মাঝামাঝি ।হালকা হালকা গরম সবে পড়তে শুরু করেছে ।সকাল সকাল জাহাজ থেকেই আমরা ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়েছি। Marseille পোর্ট থেকে

বাস ছেড়ে দিল Lourmarin এর উদ্দেশ্য। তখন বসন্ত যাই যাই করছে ।পথের দু'ধারে মাঠ ভর্তি লাল টুকটুকে পপি ফুটে আছে ।গাইড জানালো ফ্রান্সের এই দক্ষিণ দিকটায় বসন্তে পপি,গ্রীষ্মকালে জেসমিন আর গ্রীষ্মের শেষ থেকে শীতকাল আসার আগের সময়টুকু মানে জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ফোটে প্রচুর লেভেন্ডার । প্রায় তিন ঘন্টা পরে আমরা এসে পৌছলাম Lourmarin এ।বাস থেকে নামতেই চোখ জুড়িয়ে গেল।পাহাড়ের কোলে সবুজ গাছের ঘেরা টোপে ছবির মতন সাজানো বেশ নির্জন একখানি গ্রাম। ।বাড়ি থেকে Lourmarin সম্বন্ধে একটু পড়াশুনা করে এসেছিলাম বৈকি।ফ্রান্সের এই দক্ষিণ দিকটাকে বলে Province।এখানে প্রচুর perched ভিলেজ আছে। Perched ভিলেজ গুলো লুকিয়ে থাকে দুর্গম পাহাড়ের চূড়ায় ।অনেক সময় প্রাচীর দিয়েও সুরক্ষিত করা হতো এই ভিলেজ গুলিকে ।আজকাল এই ছোট ছোট সংকীর্ণ পথগুলো টুরিস্টরা হাইকিং এর জন্য বেছে নিয়েছে । Lourmarin পুরোপুরি সমতল ।বরঞ্চ বলা যায় যেন একটা উপত্যকা। তার দুদিকে Luberonপাহাড় দিয়ে ঘেরা ।একদিকে De village of Lourmarin আর অন্যদিকে Reneissance de chateau. আর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে Protestant Temple।পায়ে পায়ে হাঁটতে শুরু করলাম। আজ সারাদিন এখানেই কাটাবো ।,শান্ত প্রকৃতি, অলস তন্দ্রাচ্ছন্ন মেজাজ ।আর তার সাথে বহু যুগের সংরক্ষিত ইতিহাস –সব মিলিয়ে এই ভিলেজটা মুহূর্তের মধ্যেই মন জয় করে নিল । প্রমাণ পেলাম কেন একে বলা হয় “les Plus Beaux Villages de France” | শুদ্ধ ইংরেজিতে যার অর্থ হল “The most beautiful villages of France”|

এ শহরের রাস্তাগুলো বেশ মজার ।কোন রাস্তায় সোজা উঠে যায়নি ।গোল করে ঘোরানো ।যেন রাস্তাগুলো পাক খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে ।রাস্তার ঠিক উপরে ছবির মত বাড়িগুলো একটা একটা করে কে যেন সাজিয়ে রেখেছে । বাড়ির সদর দরজা খুললেই সোজা রাস্তায় গিয়ে পড়তে হবে। প্রতিটা বাড়ি খুব গায়ে গায়ে লাগানো ।বাড়িগুলো বেশ পুরানো ধাঁচের ।–আশ্চর্যের ব্যাপার হলো সব বাড়িগুলোর রং কিন্তু এক। দেয়াল গুলো সব হালকা খয়েরি ,ছাদে টালি । তার রং ও হলুদ বা গাঢ় খয়েরি। তবে দরজার খুব বাহার। কোনটা কালো ,কোনটা মেহগনি ,বিভিন্ন আকারের ।তার সাথে মিশে গেছে গ্রিল দিয়ে বানানো নানান কারিকুরি। প্রায় প্রতিটা বাড়ির দেয়াল বেয়ে উঠে গেছে, আইভি লতা ।, মে মাসে পাতাগুলো দেখতে লাগে সবুজ। আবার অক্টোবরে এই পাতাগুলোতে এক অপূর্ব সুন্দর কমলা রং ধরে। আমরা সেটা দেখতে পাইনি। কারণ আমরা গেছিলাম মে মাসে। প্রায় প্রতিটা বাড়ির সামনে প্রচুর গোলাপের ঝাড়, যেমন রং তেমনি সুন্দর তার গন্ধ । Cobble stone এ বাঁধান ঝকঝকে রাস্তায় অলস পায়ে হেঁটে চলেছি । রাস্তার ধারে ধারে ছোট ছোট প্রচুর দোকান ।স্থানীয়রা বলে বুটিক ।সেখানে বিক্রি হচ্ছে রকমারি ,চিজ ,মধু ,জ্যাম ,জেলি অলিভ অয়েল ,খড়ের বানানো বাস্কেট আর হ্যাট ।সবই লোকাল। কোন বড় ব্র্যান্ড বা চেন সব চোখে পড়ল না। আর বিক্রি হচ্ছে হাতে বোনা লেস ও এমব্রয়ডারি করা চাদর ,টেবিল ক্লথ ,ন্যাপকিন ইত্যাদি ।ল্যাভেন্ডারের ব্যবহার বেশ নজরে পড়ার মতো ।,সাবান ,রুম ফ্রেশনার ফুলে ভরা ছোট ছোট পাউচ ,এমনকি লেভেন্ডার আইসক্রিমও আছে ।চলতে চলতে হঠাৎ নজরে পড়ল এমন একটা জিনিস যা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। তেমাথার মত জায়গায় এসে দেখি ,পথ আলো করে দাঁড়িয়ে আছে একখানা লাল টুকটুকে ,ঝাঁ তকতকে রিক্সা ।সাইজে আমরা সচরাচর যেমনটা দেখি ,তার

থেকে একটু বড়ই হবে। ।এই প্রথম মনে হল একটা শোপিস হিসেবে আমাদের রিক্সা কোন অংশে কম যায় না ।আবার পিছনে "দিলওয়ালে দুলহানিয়া" মুভির সাজে শোভা পাচ্ছে শাহরুখ আর কাজলের দুখানা বড় বড় ছবি। মধ্যিখানে হিন্দিতে লেখা নামস্তে। আমি আর কৌতুহল সামলাতে না পেরে কাছের দোকানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম –এটা কি ? এটাকে আনা হয়েছে কোথা থেকে?সে জানালো , এটার নাম টুকটুক ।প্যারিস থেকে একে আনা হয়েছে ।সাথে সাথে অনেক গুণগান করলো ।এই যেমন– এ গাড়ি পরিবেশকে একদম নোংরা করে না ।এমনকি ইলেকট্রিসিটিও লাগে না ।বরঞ্চ বেশ ব্যায়াম হয়ে যাবে চালাতে চালাতে। ।ভাবছিলাম –বাবা তুমি মার কাছে মাসির গল্প করছো ।

চলতে চলতে নজরে পড়লো অসংখ্য ওয়াটার ফাউন্টেন ।সেটা বড় কথা নয় ।কিন্তু সাধারণ জলের কল যে কতটা শৈল্পীক হতে পারে সেটাই দেখার ।চোখে পড়ার মতো হলো Fountain aux Trios Masques পরপর তিনটি মানুষের মুখ ,আর তার থেকে নেমে আসছে জলধারা ।আরো একটা ফাউন্টেন বেশ লাগলো ।বড় একটা সিংহের মুখ থেকে জল পড়ছে। ইউরোপের অন্যান্য শহরের মতো এখানেও প্রচুর সাইক্লিস্ট চোখে পড়ল ।আমাদের সামনে দিয়ে বেশ একটা বড় দল হৈ হৈ করতে করতে চলে গেল । 30–35 জন হবে ।একদম ছোট্ট বাচ্চা থেকে শুরু করে ,–বেশ বয়স্ক সব বয়সের লোক আছে দলে ।,মনে হল কোন ক্যাম্প চলছে বাচ্চাদের ।আর সেই সঙ্গে তাদের বাবা মা এমনকি শিক্ষকরাও আছেন সেই দলে ।জীবনের গতি এখানে খুব শ্লথ । কারোর কোন তাড়া আছে বলে তো মনে হয় না। যারা টুরিস্ট ,তাদের জন্য না হয় এটা চলতে পারে।কিন্তু স্থানীয় রাও কম যায় না ।ধীরে সুস্থে সবাই আড্ডা মারতে মারতে লাঞ্চ সারছে । Café Gabi র খুব নাম শুনেছিলাম ।কিন্তু দেখলাম লম্বা লাইন ।তাতে অসুবিধা নেই ।বাধানো রাস্তার ধারে ধারে অসংখ্য খাবার জায়গা ।এরকম একটা ছোট মতন খাবার জায়গায় ঢুকে পড়লাম ।হালকা কিছু অর্ডার করলাম ।অলস দুপুর ,দূরে বেলটাওয়ার থেকে ভেসে আসছে ঘন্টার আওয়াজ ।বেলটাওয়ার হল চার্চের পাশে যে লম্বা স্থাপত্য গুলো দেখা যায় ,যার মাথায় বসানো থাকে বড় বড় ঘন্টা ।সে গুলোকে বলে বেল টাওয়ার ।ঘন্টার আওয়াজ এত গুরুগম্ভীর যে চোখ বন্ধ করলেই সহজে কল্পনা করতে পারবে একটা জীবন্ত মিডাইভাল ভিলেজ এর ছবি।এই ভিলেজের সবথেকে বড় আকর্ষণ হল Chateau de Lourmarin।কার্যত এটা একটা বড়সড় দুর্গ ।১২ শতাব্দীতে গথিক স্টাইলে বানানো হয় এই দুর্গ বা Castle টি ।১৬০০ শতাব্দীতে এই দুর্গটা পাল্টে যায় একটি রেনেসাঁস ক্যাসেলে ।তারপর পরিচর্যার অভাবে ধীরে ধীরে সুন্দর ক্যাসেলটা পরিণত হয় একটা ধ্বংসস্তুপে । অবশেষে ১৯১৭ সালে Robert Laurent- Vibrant নামে একজন শিল্পপতি ,যিনি শিল্প অনুরাগীও বটে, এই ক্যাসেলটা কিনে নেন আর তার সংস্কারও করেন। মাত্র চার বছরের ব্যবধানে এক গাড়ি দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান। সেদিন সময়ের অভাবে chaetaeu র ভিতরটা ঘুরে ঘুরে দেখতে পারিনি। সময় পাইনি এই chaetaeu র লাগোয়া অতি পুরাতন Protestant Church টা ঘুরে দেখার ।এখন যার নাম Temple de Laumarin আরো কিছু দেখা বাকি রয়ে গেল। ।যেমন নোবেল প্রাইজ পাওয়া লেখক ,নাট্যকার আলবার্ট ক্যামুর বাড়ি ,তার সমাধি। তার নামে Loumarine এ একটা রাস্তা আছে । নোবেল প্রাইজের টাকায় তিনি এই ভিলেজে একটি বাড়ি কিনেছিলেন ।এখন সেই বাড়িতে তার মেয়ে ক্যাথরিন ক্যামু থাকেন। কোথাও

একবার পড়েছিলাম এক যাত্রায় সবকিছু মিটিয়ে ফেলতে নেই । তাহলে ফিরে যাওয়ার তাড়া থাকে না । তাই –যেটা হলো না সেটা না হয় কল্পনাতেই থাক। হয়তো কোন একদিন সত্যিই আবার হবে।কে বলতে পারে ?

Chateau de Lourmarin, France.

ঐ দাগ – টাই

অরুণজিৎ দত্ত

চাইলেই চট করে ভোলা যায় না কিছু এতো
যেমন তৎক্ষণাৎ সেরে যায় না কোনো ক্ষত।
ক্ষতির সাথে লড়তে লড়তে এক সময়
ক্ষতরাও সয়ে যেতে শেখে, শিখতে হয়।
সকল ক্ষতির মেলে কি সমাধান?
পালা শেষের অঙ্কে অপেক্ষার অবসান।
সময় ভুলিয়ে দেবে জানি ক্ষতি,
বিস্মৃতিতে ধুলো পড়া যতো স্মৃতি
মিলিয়ে গিয়েও থাকে এক চিহ্ন ক্ষত,
মুছবে না দাগ, মুছতে চাইবে যতো..
ঐ দাগটাই বুঝি প্রেম ? নাকি দাগটাই গভীর ক্ষত !

মেঘ–বৃষ্টি, রাগ মালহার আর প্রেমের দিব্যির মান্ডু

সুতপা ভৌমিক

সেদিন সকাল থেকেই বৃষ্টি। হাওয়ার গতিও স্বাভাবিক নয়। স্থানীয় মানুষের ভাষায়, 'তুফানি মওসম'।

এমন আবহাওয়ায় খুব প্রয়োজন না হলে ঘর ছাড়ে না মানুষ। কিন্তু আমার আর সঙ্গী ৬ জনের একে–অন্যের হাত ধরা যতটা সহজ, 'অজুহাত'–এর ততটা নয়।
সফরসূচি বলছে, উজ্জয়িনীর মেয়াদ ফুরিয়েছে। যেভাবে হোক মান্ডু পৌঁছতে হবে। অতএব রওনা।

গাড়ির চালক বারবার আবহাওয়া নিয়ে সতর্কবার্তা দিচ্ছিলেন। দেরি হলে সন্ধে নামলে রাস্তায় বিপদ। একে বৃষ্টি, তায়ে বিপদ! দুটো শব্দই ভয় ধরিয়ে দিতে যথেষ্ট।
কিন্তু সে ভয়ে কুঁকড়ে গেলে তো এগোনোই যাবে না। তারওপর সফরসঙ্গীরা যখন অধিকাংশই সিনিয়র সিটিজেন। তাই এক পৃথিবী সাহস, হরেকরকম গল্প আর শুকনো খাওয়ারের ঝোলা খানিক পরে পরেই আলগা করতে হচ্ছিল। যে, যেমন খুশি করে সেই আলগা ঝোলা থেকে রসদ নিচ্ছিল।
টানা বৃষ্টির একঘেয়েমি ঠেলে গাড়ি এগোচ্ছিল। সঙ্গে আমরাও। আশায়, আরেকটু এগোলে হয়তো আবহাওয়া ভাল হবে। আরেকটু এগোলে হয়তো বুনো গন্ধ আর সবুজের ভিড় ঠেলে বেরিয়ে আসবে একফালি রোদ। কিন্তু কোথায় কী! উল্টে মেঘ আর বৃষ্টি ঘন হচ্ছিল আরও।

তিন, সাড়ে তিন ঘন্টার রাস্তা। কিন্তু মন্দ আবহাওয়ার সামনে সময় বারবার হারছিল। সেদিনও হার নিশ্চিত অনেক আগে থেকেই সে আভাস ছিল। কিন্তু গো হারা নাকি ব্যবধান মারাত্মক সেটা চালক কিংবা আমরা কেউই জোর দিয়ে বলতে পারছিলাম না। শেষমেশ ঘন্টা ছয়েক লেগে গেল। মান্ডুর মালওয়া রিট্রিট পৌঁছতে। আমাদের পরবর্তী দু'রাতের ঠিকানা।

ঘড়িতে তখন বিকেল সাড়ে চারটে হবে। ঝড় থামার পর চারদিক শান্ত। তবে ইলশেগুড়ি বৃষ্টি তখনও চলছে। রিসেপশনের কাঁচের দরজা ঠেলে ঢুকতে একপাশে বসার জায়গা, আরেকদিকে ডাইনিং–কিচেন। ব্রেকফাস্ট আর সঙ্গের মুখোরোচক হজম হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই। কিচেন এত কাছে দেখে পেটের ভেতর থেকে ডাকাডাকি শুরু হল।
বুকিংয়ের কাগজ, পরিচয়পত্র দেখাতে আমাদের দুই অভিজ্ঞ সঙ্গী যখন ব্যস্ত, সেই ফাঁকে তন্দুরী রুটি, জিরা–আলু আর লাল, লাল চিকেনের ঝোল অর্ডার দেওয়া শেষ। দুর্যোগের আবহাওয়ায় দুটি পরিবার সফর বাতিল করায়, আমরা কী করব তা নিয়ে কিছুটা সন্দিহান ছিলেন হোটেল কর্তৃপক্ষ। খারাপ আবহাওয়ার কারণে টাওয়ারের সমস্যায় ফোনেও যোগাযোগ করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত আমরা উপস্থিত হওয়ার পর ওঁরা

আশ্বস্ত হয়ে সাজানো–গোছানো রুম আরও কিছুটা পরিপাটি করার সময় চাইলেন। কথা দিলেন লাগেজ নির্দিষ্ট ঘরে পৌঁছে দিয়ে, চা–কফির বন্দোবস্ত রেখে অতিথি আপ্যায়নে কোনও ত্রুটি রাখবেন না। আমাদেরও তখন ঘরে যাওয়ার আগে পেটে কিছু দেওয়া দরকার মনে হচ্ছিল। অতএব সময়ের সদ্ব্যবহার। ধোঁয়া ওড়া খাবারে মনোযোগী হলাম সাতজনই। আধঘন্টার মধ্যেই মন ও পেট দুই–ই তৃপ্ত। সে তৃপ্তি আরও বাড়ল হোটেলের রুমে পৌঁছে। চমৎকার বন্দোবস্ত। পাশাপাশি তিনটে ঘর। দু'দিকেই বারান্দা। মাঝে চাতাল। একপাশে গাড়ি রাখার ব্যবস্থা। অন্যদিকে স্লিপ, দোলনা লাগানো। ছোটদের জন্য। চারদিকে শুধু সবুজ। এতরকমের সবুজ! বৃষ্টি ধুয়ে আরও সতেজ। শরীর, মনের ক্লান্তি মুহূর্তে মিলিয়ে গেল।

একটু বাদেই সন্ধে নামবে মান্ডু ওরফে মান্ডবগড়ে। বিকেলের আলো একটু, একটু করে ফুরিয়ে আসছে। এখন কি ঘুরে দেখা যাবে কাছে–পিঠের কোনও জায়গা। প্রশ্নটা করা মাত্রই সঙ্গীদের কেউ, কেউ হাত তুলে দিলেন। বেরোতে নারাজ। পক্ষেও অবশ্য দু'জনকে পাওয়া গেল। রিসেপশনে প্রশ্ন করতে 'হ্যাঁ' আর 'না'–এর মাঝামাঝি উত্তর এল। সেকথা অবশ্য গররাজিদের বলা যাবে না, বিলক্ষণ জানতাম। অতএব বেরিয়েই পড়লাম। পায়ে হেঁটেই। চড়াই রাস্তা। পারব? প্রশ্নটা সঙ্গে করেই এগোব ভাবছি, হঠাৎ দেখতে পেলাম উল্টোদিক থেকে নেমে আসছেন আমাদের গাড়ির চালক। 'কঁহি জায়েঙ্গে? পয়দাল টাইম লাগ জায়গা।' কোথায় যাব, কোথায় যেতে চাই জানার সময়টুকু সে দিতে চায় না। পরিষেবায় যেন ত্রুটি না থাকে, সে ব্যাপারে বাড়তি সজাগ। উঠে পড়লাম। এবড়ো–খেবড়ো পাহাড়ি রাস্তা পেরিয়ে খানিক সরল রাস্তা। সেই রাস্তাই নিয়ে দাঁড় করাল 'জাহাজ মহল'–এর সামনে।

জাহাজ মহল। মান্ডুর সুলতান গিয়াস–উদ্দিন–খিলজির সময় এই মহল তৈরি। সুলতান গিয়াসের প্রেম আর একাধিক নারীসঙ্গ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে ১৫০০০ নারীকে একছাদের নিচে রাখার জন্যই এই মহল গড়ে তোলেন। সাধারণের চোখের আড়ালে যাতে এই নারীরা থাকতে পারেন অথচ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে যাতে তাদের জীবনযাপন হয়, সে কথা মাথায় রেখেই তৈরি হয় মহল। পরিখা হিসেবে বিশাল জলাশয়। সুলতান গিয়াসের মৃত্যুর পর অবশ্য এ মহলের জৌলুস কমতে শুরু করে। এ মহলে ১৬১৭ সালে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গির আর তাঁর বেগম নুর জাহানের পা পড়েছিল। তারপর আর রাজ ঘরানার কারও আগমন ঘটার ইতিহাস পাওয়া যায় না।
আরও কিছুটা সময় ধরে এ মহলে ঘুরে বেড়ানোর ভাবনাটা হোঁচট খেল নিরাপত্তারক্ষীর তাড়ায়। সময় শেষ। ফিরতে হবে। অগত্যা...।

সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গেই শীত, শীত করছিল। সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছিল হাওয়া। আবার বৃষ্টি শুরু হল হোটেলে ঢোকার আগেই। সন্ধে পেরিয়ে কখন রাত নেমেছে, জমাটি আড্ডায় খেয়াল ছিল না। হুঁশ ফিরল রেস্তোরাঁর ফোনে। 'ডিনারে কী নেবেন?' সবাই একসুরে বলে উঠল, খিচুরি হলে জমে যাবে। করব কী করব না–র দ্বিধা নিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটা করেই ফেললাম। ফোনের ওপার থেকে উত্তর এল, 'সম্ভব। পাঁচমেশালি খিচুরি। চলবে?' চলবে মানে দৌড়বে। বর্ষার আবহ, সঙ্গে খিচুরি। তাও ঘর ছেড়ে এত দূরে! অর্ডার হয়ে গেল। খিচুরি আর ডিমভাজা।

আহা, এমন রাত রোজ, রোজ কেন আসে না! মনে মনে এই অনুভূতি যখন সুখের সাগরে ভাসাচ্ছে, ঠিক তখনই রাত যেন 'বিশ সাল বাদ' ছবির গা ছমছমে ভাব নিয়ে এল।

রাত তখন ক'টা হবে, মনে নেই। হঠাৎ মড়মড় শব্দ ঘরে। ঘুমের ঘোরে কীসের শব্দ বুঝে ওঠার আগেই থতমত খাওয়ার জোগাড়। এ কী ঘরের মূল দরজা খোলা! কে খুলল? কীভাবে খুলল? ঘুমোতে যাওয়ার আগে ঠিকমতো দরজা লাগানো হয়েছে কিনা সে পরীক্ষা করতে ভুল হয়নি। তারওপর দরজার সামনেই সেন্টার টেবিল টেনে আলাদা করে লাগেজ রাখা হয়েছিল। সে টেবিলেরও খানিক স্থানচ্যুতি ঘটেছে! হলটা কী? কূল কিনারা যখন পাওয়া যাচ্ছে না, তখন পাশাপাশি দুই ঘরের বাসিন্দাদের ঘুম ভাঙাতেই হল। বাইরে তখনও জোর বৃষ্টি। ঝোড়ো হাওয়া। একটু দূরে রিসেপশনে গিয়ে বা সিকিউরিটির কাউকে ডেকে আনা হবে, সে উপায় নেই। ঘরগুলো যেমন সুন্দর, তেমন অবাক করাও। কারণ, প্রতিটি রুমের সামনে–পেছনে বারান্দা! তবে কি পেছনের বারান্দায় কেউ গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে? ভাবা মাত্র খোলা হল দরজা। কিন্তু দেখা দিল নতুন বিপত্তি। হাওয়ার তোড়ে তখন দরজা বন্ধ করা দায়। অনেক কষ্টে বন্ধ হল। কিন্তু ততক্ষণে ভিজে গেছে গায়ের জামা–কাপড়। ঘরের মেঝেও। আর তখনই বিপদের মুখোমুখি আবার। লোডশেডিং। এই রে, এবার কী হবে? কিছুটা খোঁজাখুঁজির পর ব্যাগ থেকে বেরোল টর্চ। সে আলোতেই তখন স্বস্তি। এত কান্ড যখন চলছে, কথার ফোয়ারা ছুটছে, তখন ছাতা মাথায় টর্চ হাতে কেউ একটা রিসেপশনের দিক থেকে চাতাল পেরিয়ে এগিয়ে আসছেন মনে হল। ভুতুড়ে আবহে ওই মুহূর্তে একটা গানেরই যা অভাব। সেই ভয় ডিঙিয়ে যিনি চৌকাঠে এসে দাঁড়ালেন, তিনি ম্যানেজার। বিনীত স্বরে বললেন, 'বিজলি চলি গয়ি হ্যায়। আভি জেনারেটর চালু হোগা। চিন্তা মাত কী জিয়ে।' আধা বাংলা, ভয়ঙ্কর হিন্দি আর চলনসই হিন্দি সব মিলিয়ে ম্যানেজারকে বলা হল আমাদের সঙ্গে যা ঘটেছে, সেই ঘটনা। শুনলেন কিন্তু খুব ঘাবড়েছেন মনে হল না। বললেন, 'ও কোই নেহি। তেজ হাওয়া কী বজা সে হো সকতে হ্যায় লক খুল গয়া। চিন্তা কী বাত নেহি। ইঁহা সিকিউরিটি কা কোই প্রবলেম নেহি।'
আশ্বস্ত করলেন। হলাম কি?

কী জানি কী বুঝলেন ম্যানেজার বাবু। যেতে যেতে খালি বললেন, 'সায়দ রানি রূপমতী আয়ি থি। আপ লোগো সে মিলনে। উনকি মহল ঘুমনে গেয়ে থে সাম কো? আগার নেহি গয়ে, কাল সুভে জরুর জাইয়ে গা...'
কথা শেষে হাসি খেলে গেল ভিন ভাষী ম্যানেজার বাবুর ঠোঁটের কোণে।
রসবোধ। বুদ্ধিমত্তা। মধ্যরাতে ঝিলিক দিল ঘোলাটে মেঘের ফাঁকে চাঁদের হাসির মতো। রূপমতী মহল। এরপর না দেখে থাকা যায়? পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট সেরেই আমরা রওনা হলাম। মহল দেখতে। রাজা বেজ বাহাদুর আর তাঁর রানির প্রেমকাহিনী কান পাতলেই শোনা যায় এ মহলের আনাচে–কানাচে। রানি রূপমতী ছিলেন শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পী, কবি। রাজা বেজ বাহাদুরের সঙ্গীতানুরাগও কোনও অংশ কম ছিল না। রাগ দীপকে তাঁর দক্ষতা ছিল অসম্ভব। অন্যদিকে রূপমতী পারদর্শী ছিলেন রাগ মালহার–এ। বলা হয়, তিনি রাগ মালহারে ডুবে গেলে আকাশ ঘন মেঘে ছেয়ে যেত। রূপমতীর গানে মুগ্ধ হয়েই বেজ বাহাদুর তাঁকে মান্ডু আসার আমন্ত্রণ জানান। রূপমতী রাজি হন।

কিন্তু শর্ত দেন নর্মদা নদীর ধারে শুধু তাঁর জন্য আলাদা মহল থাকতে হবে। সেই শর্ত মেনেই তৈরি হয় মহল। কিন্তু মুঘল সম্রাট আকবর ঠিক করেন মান্ডু দখল করবেন। তিনি আদম খানকে পাঠান। বেজ বাহাদুর তাঁর সামান্য সেনা বাহিনী নিয়ে লড়লেও শেষ পর্যন্ত হেরে যান সেই লড়াই। বেজ বাহাদুর সাহায্য চাইতে বাধ্য হয়ে চিতোরগড় চলে যান। সেই সময় আদম খান মান্ডু প্রবেশ করেন। আর প্রবেশ করেই রানি রূপমতীর রূপে মুগ্ধ হয়ে যান। কিন্তু আদম খানের হাতে বন্দী হতে ঘোর আপত্তি ছিল রানির। চরম সিদ্ধান্ত নেন। বিষ পান করে আত্মহননের পথ বেছে নেন তিনি। আর এভাবেই সমাপ্তি ঘটে রাজা আর রানির প্রেমকাহিনী।
শোনা যায়, অমর প্রেমকাহিনীর স্থাপত্যই একসময় হয়ে উঠেছিল সৈনবাহিনীর ঘাঁটি। আসলে গোটা শহরের ওপর নজরদারি করার জন্য এর থেকে উপযুক্ত জায়গা আর ছিল না। ফলে সেনাদের বুটের আওয়াজ ধ্বনি–প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরত মহলের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে।

সময়ের সঙ্গে এই মহল যত গল্পেরই সাক্ষী থাকুক, আজও তা অন্য ভাল লাগার মুহূর্ত উপহার দিয়ে যায়। আর মহলের দুই ওয়াচ টাওয়ার থেকে গোটা শহর দেখার আনন্দ যে ঠিক কী রকম তা বুঝতে একবার অন্তত এখানে পৌঁছনো জরুরি।
মান্ডুর দর্শনীয় স্থানের তালিকায় আরও অনেক কিছুই আছে। তার মধ্যে ‘হিন্দোলা মহল’ (সুইং প্যালেস) আরও এক বিস্ময়ের উৎস। ইংরেজি ‘টি’ হরফের আকারে এই মহল তৈরি। আগে এটা ওপেন এয়ার থিয়েটার হিসেবে ব্যবহৃত হত। মান্ডু ভ্রমণ সম্পূর্ণ হবে না যদি আপনি এই স্থাপত্যের সাক্ষী না থাকেন।

মধ্যপ্রদেশে দেখার জায়গা, ঘোরার জায়গা অনেক। ভাল লাগার জায়গাও অনেক। কিন্তু একটু আলাদা, একটু অন্যভাবে প্রকৃতি আর ইতিহাসকে ছুঁতে চাইলে মান্ডুতে পৌঁছতেই হবে। না হলে, নিজ অভিজ্ঞতায় বলতে পারি মধ্যপ্রদেশ দর্শন অসম্পূর্ণ

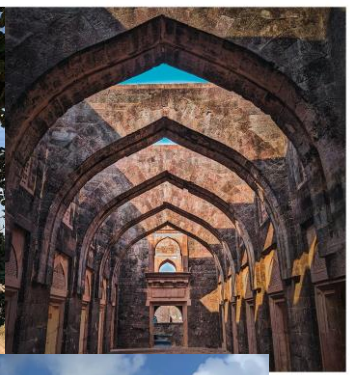
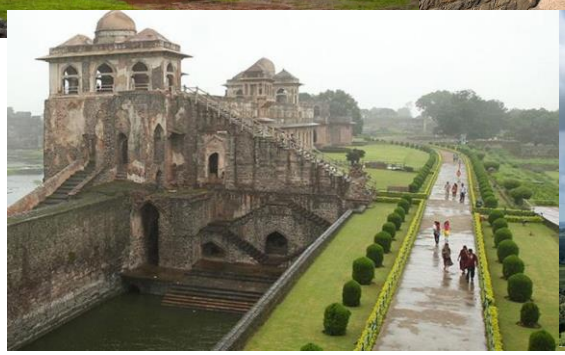
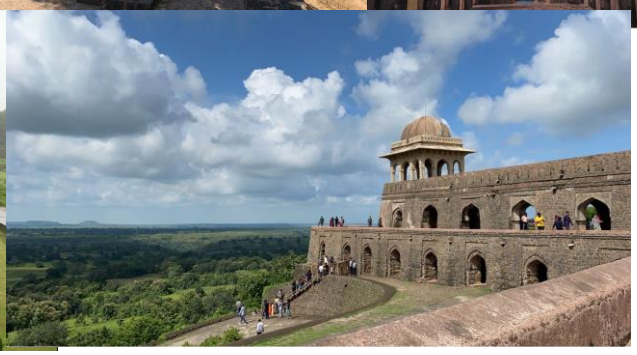

ভাসান

২১০০ সন, Climate Change এর জন্য হরিৎপুর গ্রামটি জলমগ্ন। গ্রামের মানুষ এখন নৌকায় বাস করে। এটা তাদের গল্প..

অয়ন গুহ

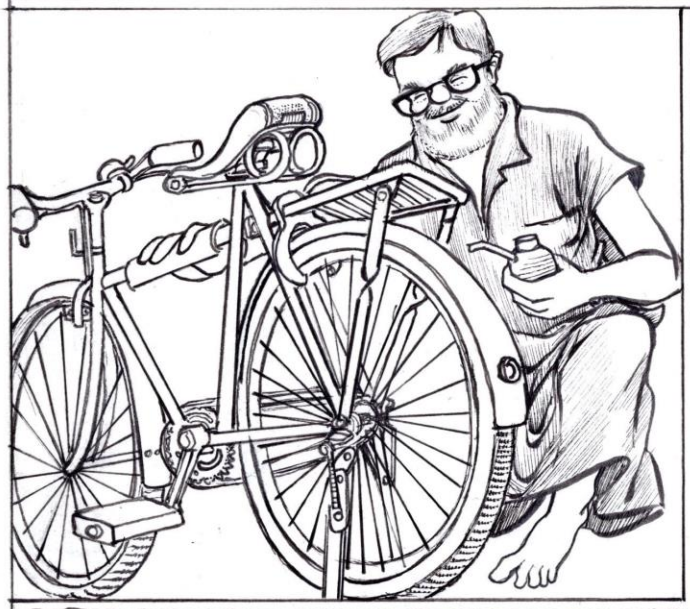

আজ সেই গ্রাম, সেই মাঠ সব জলের তলায়। কতদিন মাঠের সবুজ ঘাসে হাটিনি!
বাবা বলেছে সামনের বছর আমরা শহর বেড়াতে যাবো..সেখানে রাস্তা আছে, মাঠ আছে।
তুমিও যেও আমাদের সঙ্গে..
এই সেরেছে পাগলটা আবার এসেছে
ও দাদু – হেভি খবর আছে মনুদার বৌ পালিয়েছে
গতকাল হেভি ঝগড়া করে মনুদা বেড়িয়ে গেলো..
কে কারে কয় আমিও দেখে নিব।
পরদিন গিয়ে দেখে বৌ, বাড়ি সব Vanish!
একি!
হেভি idea দাদু - বৌদি বাপের বাড়ি গেল- বাক্স প্যাটরা নয়- একটা আস্ত বাড়ি নিয়ে।

গতবছর আমাদের দুর্গাঠাকুরের কাঠামো ভেসে গেছে। এবছর প্রতিমার কাঠামো করার কোনো কাঠ নেই। কিছু একটা উপায় বলুন?
কাঠামো লাগবে? কোন চিন্তা নেই। একটা উপায় আছে..
আমার জলের ট্যাংকের ব্যাবসা ছিলো। এখনো কতো ট্যাংক Storage এ ভর্তি। এগুলো দিয়ে কাঠামো বানানো যায় না ?
আপনার কতোগুলো ট্যাংক!! আমাকে দুটো দিন না।
তুই ট্যাংক নিয়ে কি করবি? যাঃ ভাগ্ এখান থেকে..
ঠিক আছে - পরে আমাকে দোষ দেবেন না।
মহাষষ্টির দিন
বাঃ, ট্যাংকের কাঠামো ভারি মজবুত। ডুববে না.. ডুববে না..

আবার এখানে ঘুরঘুর করছিস? ভাগ্ এখান থেকে – আর যেন না দেখি তোকে..
পাগলাটাকে তাড়িয়ে দিয়েছি। সারাক্ষণ কাঠামোর কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে।
আপদ বিদেয় হয়েছে।
দশমীর দিন
ঠাকুর ?? কোথায়
মাঠ ঘাট জলের তলায়। বাড়ি ঘর ডুবে গিয়েছে। আজ ভাসানের দিনে – তুই ভেসে থাক মা, আমাকেও ভাসিয়ে রাখ।
শোনো ভাই হৃদয় ভরে, ট্যাংকি ভড়ে থাকতো জলে মানুষ থাকতো চরে, এখন জমি কেড়েছে জলে মানুষ ট্যাংকি চড়ে।
সমাপ্ত

কবি হওয়া

শুভ্র চ্যাটার্জি

বউ বলেছে লিখতে আমায়
একটি খানি কাব্য ,
সারা দিনই ব্যস্ত আমি
সময় কোথা ভাববো ।

ব্যস্ত আমি সকাল থেকেই
চায়ের জলটি বসিয়ে ,
একটু খানি মোবাইল ফোনে
চ্যাটিং করি রসিয়ে ।

এরপরেতেই অফিস বস
হরেক রকম আবদার ,
মিটিং মিছিল সারাদিন
তাকে তুষ্ট করতেই জেরবার ।

কোনোমতে লাঞ্চটি সেরে
চেয়ারেতে ঘাড় গুঁজে ,
ল্যাপটপে তাকিয়ে থাকি
চোখ দুটো আসে বুঁজে ।

এমন করেই সন্ধ্যে নামে
মনটা হয় চঞ্চল ,
এখন আমার মি টাইম
কেউ করবে নাকো কন্ট্রোল ।

একটু আবার ফোনটা নিয়ে
দিনের শেষের গল্প ,
রিমোটটাকে হাতে ধরে
চ্যানেল ঘুরিয়ে নি অল্প ।

একটু নিউজ একটু শো
একটু আবার সিরিয়াল ,
ডিনার সারি টাইম মাফিক
নইলে জুটবে ওনার গাল ।

এরপরেতে বাসন মেজে
সটাং শুই খাটে ,
সোম থেকে শুক্র এমন
ঘোর ব্যস্ততাতেই কাটে ।

হপ্তা শেষে চলে আসে
উইকেন্ড নামক বস্তু ,
হয়ে উঠি লাগাম ছাড়া
সঙ্গে আমার প্লাস টু ।

দুপুরেতে লাঞ্চ আউট
সোশ্যাল পার্টি নাইট ,
ফুর্তি চলে সারা দিন
গ্লাসে তরল লাইট ।

এবার বলুন লিখব কখন ,
পড়ব কখন বই ,
যখন বলি সময় কোথায়
খাঁটি কথাই কই ।

ফোনেই থাকি ব্যস্ত আমি
সোম থেকে যে রবি ,
লেখা হয় না কবিতা আর
হয়ে উঠি না কবি ।

জয়সলমীর

রূপা মুখার্জী

সোনার কেল্লা, সোনার কেল্লা,
আজ ও তোমার একই জেল্লা !!!!
রাজা জয়সলের তৈরি ১১৫৬ শতাব্দে ।

থার মরু, তৃকুঠা পর্বতে তুমি অবস্থিত,
বেলেপাথরে কারুকার্য করা শিল্পীদের কলা সাক্ষরিত॥

সত্যজিৎ রায়, মুকুলের মুখে প্রথম পরিচয়,
উট, ময়ূর, রাজা, রানী, হাভেলী করে বিস্ময় !!

রঙীন বাঁধনি কাপড়ে মেয়েদের হাসিমুখ,
জীবনের প্রতিকুলতায় যেন তারা বিমুখ।

মরুতটে উটের পিঠে দিগন্ত পরিদশর্ন,
মেঘেদের মাঝে লাল, হলুদ বেগুনির অনাবিল শোভন ॥

গাদীসার লেকে সূর্যাস্তের দৃশ্য অভিনব !
মুক্ত পাখীরা নীড়ে ফেরে,
ওদের কলরবে ও কলতানে,
চারিদিক যেন উৎসব সঙ্গীতে মুখরীত !

ভাস্বর আকাশে বিধাতার ভাস্কর্য কি অপরুপ ও আশ্চর্য!
সত্যি একবারে পূর্ণতাপ্রাপ্ত॥

রাভাহাট্টা (Ravanhatta) বাদ্যযন্তের সাথে গান,
আর খরতালের তালে ঘুমর নাচ,
রাজস্থানি লোকসংগীত সত্যই মনে দেয় স্থান।

চাঁদনী রাতে এ এক অপুর্ব অভিজ্ঞতা !!
পরান ছুঁয়ে যায়, দূর করে দেয় সমস্ত মলিনতা॥

আলো, আঁধারের একি খেলা,
রঙ ও রূপের অপুর্ব মেলা ॥

মরুভূমির এই বিচিত্র চিত্র করে আমায় উন্মুখ,
আর হৃদয়ে আনে চিরন্তন সুখ !

জয়সলমীরের সকল স্মরণীয় মুহূর্ত,
জাগায় মানুষ, ইতিহাস ও প্রকৃতির গুরুত্য ।

সোনার কেল্লা, তোমার সম্মোহনী সৌন্দর্য্য,
সত্যই দিয়েছে আমায় আপ্লুত আনন্দ ও মনে মাধুর্য॥

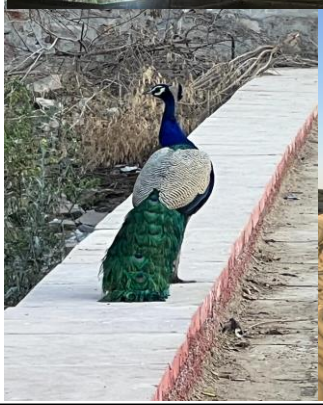

পাহাড়দের গল্প

সহেলি বন্দ্যোপাধ্যায়

যেখানে পাহাড়দের ঢল্ নেমেছিল
ছোটো,বড়, কাছে, দু.....রে অনেক রকম পাহাড়..

কাছের পাহাড়টা ছিল ভীষণ হিংসুটে, তার বুক ছিল সবুজ জঙ্গলেভরা..
স্বভাব একেবারেই নবীন জোয়ানদের মতো
তার পায়ের কাছের নীলচে সবুজ জলটাকে সে সারাক্ষন আগলে রাখতো ..
উপরের নীল আকাশটা ভাব করতে এগিয়ে আসতে চাইতো ..
কিন্তু পাহাড়টা মাঝে বেড়ি হয়ে দাঁড়াতো ...
তাই ওপরের আকাশের সাথে জলের সম্পর্ক ছিল প্রতিবিম্বের
আকাশ একটা আয়না দিয়ে তার মুখের ছবি ফেলতো জলে ..
নিজের বুকের মাঝে আকাশের প্রতিচ্ছবি দেখে মুখ ঢাকতো লজ্জায় জল ...
আর তার সবুজ রং আরো গাঢ় হয়ে হতো নীলাভ ..

দূরের পাহাড়টার অবশ্য গল্প ছিল অন্য ..
সে ছিল বৃদ্ধ ধ্যানরত সন্যাসী .. তপস্যামগ্ন
সাদা বস্ত্রে নিজেকে আবৃত করে দুবাহু উর্ধে তুলে
পরম প্রাপ্তির তৃপ্তির আস্বাদে পূর্ণ হতো সে ..

একদিন কাছের পাহাড়টায় ঘনিয়ে এলো কালো মেঘ
নিকষ কালো সেই মেঘে নবীন পাহাড়টার বুক গেলো ঢেকে
আকাশের বুক চিরে খান খান শব্দে বিদ্যুৎ রেখা নবীন পাহাড়টাকে চূর্ণ চূর্ণ করে দিতে চাইলো
আকাশের যত ব্যাথা এতদিন জমীভূত ছিল
জলের বিরহে
তা এখন বৃষ্টির শব্দে কান্না হয়ে ঝরতে লাগলো জলের ওপরে
নিয়মহীন বন্ধনে ...
এখন শুধু আকাশের সাথে জলের মিলনের সন্ধিক্ষণ
শুধু নির্বাক সাক্ষী হয়ে দেখা ছাড়া
নবীন পাহাড়টার আর কিছুই রইলো না পড়ে
আসলে স্বভাবে কঠিন হলেও
নিজের পায়ের কাছের জলটাকে
সে নিজের মতো করে ভালো বেসেছিলো
খানিকটা অধিকার বোধ ও কাজ করতো তার ..
সে চাইতো ভালোবাসলেও জল থাকবে তার পায়ের তলায় চিরদিনের মতো ...

দুরেরটা পাহাড়টা দূর থেকে
লক্ষ্য করলো সবই
অনুভব করলো তার অতীত
সে নিজেও যখন ছিল একদম নবীন
কত গাছগাছালি গজিয়ে ছিল তার ওপরে,
কত পাখি এসে গান শোনাত।।
তারপর কি যে হলো
কঠিন থেকে কঠিনতরো
শীতল থেকে শীতলতম হতে হতে
সে নিজেকে সন্ন্যাসী
করে তুললো

দূরের পাহাড়টা বাড়িয়ে দিলো
তার তুষারাবৃত হাত
নবীন পাহাড়টার দিকে
কনকনে হিমেল হাওয়ার সাথে সাথে
তুষার এসে নবীন পাহাড়টাকে
ঘিরে ফেলতে লাগলো
যেন প্রবীণ পাহাড়টা নবীন পাহাড়টাকে
রক্ষা করতে চাইলো এই ভাবেই
স্নেহাতুর সাদা চাদরের আস্তরণে ...

এই ভাবেই এমন কত পাহাড়ের গল্প লেখা
হতে থাকে
পাথরের খাঁজে খাঁজে
যদি দেখতে পাও,অনুভবে পাও
যত্ন করে সাজিয়ে রেখ সেই মর্মে ...
কখনো কোনো ভাবে
সে গল্প,
হয়ে উঠতেও তো পারে
তোমার বা আমার নিজের গল্প.....

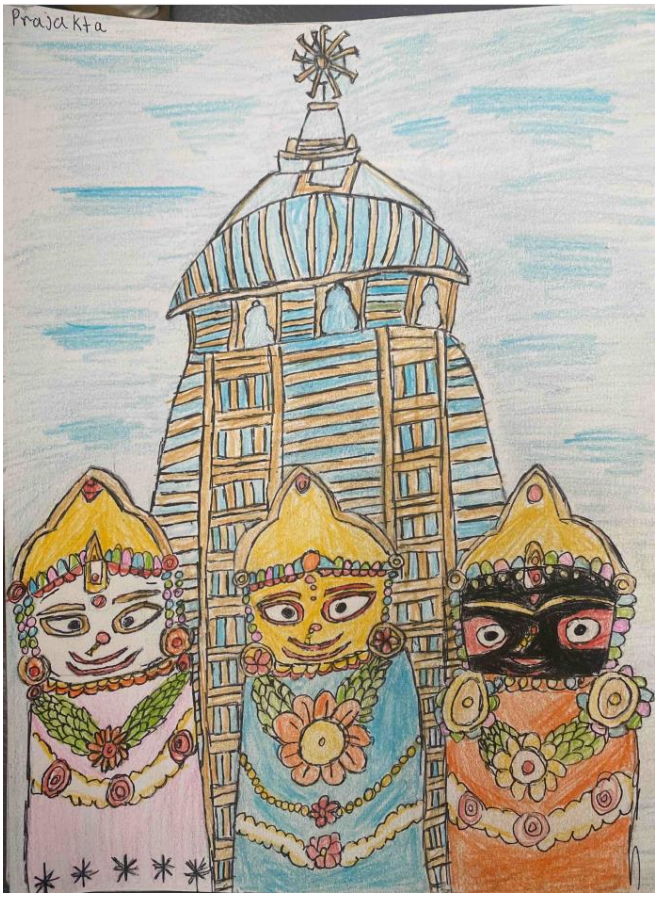

Lord Jagannath Balaram and Subhadra
Prajakta Bhattacharjee (10)

Arandhuni

Debasree Dasgupta

"কী যে হবে তোর! কী করে সামলাবি ? কিছুই তো জানিস না"
No, my mother was not expressing panic at my knowledge in general. This outburst, accompanied with intense wringing of hands, was caused by distress at my knowledge of culinary skills, or lack thereof. I was tempted to remind her that the few times I had ventured into the kitchen with any amount of curiosity, my mother had shooed me away…."পড়াশোনা করো যাও, সময় হলে নিজেই রান্না শিখে যাবে"
Instead, I announced with confidence that I definitely did not feel…"কেন? আলু সেদ্ধ, ডীম সেদ্ধ, ভাত....এগুলো বানাতে পারবো না?" This sent her into a tizzy, her eyes shot up into her forehead and her hands stopped the wringing so they could support her face.
"এই খেয়ে সারাজীবন কাটাবি? বেচারা ছেলেটাকেও তাই খাওয়াবি?" did I detect more concern for my husband than me here?

My mother had every reason to worry. She was as surprised by my wedding as I was. In those days the University at Calcutta had acquired a solid reputation of being unable to hold anything in a timely manner. As expected, our exams were postponed from June, eventually to December. When we completed our BA coursework, we were sent packing so the hostel could welcome freshmen boarders. So, I went home to Ranchi to enjoy this respite and promptly forget what little I had learned in the past year.

When December arrived my mother and I returned to Calcutta for the exams. At about the same time, my would-be-husband also travelled to Calcutta to renew his quest for a bride. His uncle, who had never met me but was related by marriage to my sister, assumed that I was as skillful in the kitchen as she was and possibly as pretty as she was too. Excited and full of pride about their own end of the prospective match, the two of them conspired to have us meet the day before the exams started. I agreed, since I was driven by curiosity as well as the feeling that I had nothing to lose. If anything, I could always blame my less than desirable results on this distraction; for I knew that they would surely disappoint all those who were used to my supposedly excellent academic performance thus far.

However, living away from home had opened up for me vistas beyond just academics. Without my father present, my mother was completely confused, uttering only mild objections to the fact that I would have to settle in the US.

My sister just brushed away the bewildered look on her eyes and sent a telegram to my father that contained words like, ”Please come to Calcutta immediately with funds to hold a wedding”. Equally confused, my father showed up, uttering much louder protests which faded away when he was told about this extremely eligible “পাত্র”. And so, 12 days after my exams ended, I was married. And reality set in.

A week after the wedding my husband returned to the US and I went with my in-laws to spend the next couple of months in Kalyani to await my visa. Now Kalyani is possibly the last place a girl, fresh out of a raucous college hostel, should try to adjust to. While the place was beautiful and serene, with towering trees over lush meadows, homes adorned with bougainvilleas and a multitude of other flowers, too much serenity doesn’t always sit well with a 21-year-old. I did enjoy the time I spent with my new ঠাকুরমা, and puttered around the garden with বাবা but the only excitement came from the occasional raids from the hanumans. They would descend on the guava and papaya trees, and polish off all fruit, chasing my cursing mother-in-law back into the house when she threatened them with a stick. So, I listened to music, paced about the house and yawned a lot. I did try stepping into the kitchen but I was now shooed out by my mother-in-law, who claimed that her culinary skills were questionable. As I was unable to argue that, for I did find myself sneaking into ঠাকুরমা’s little cooking corner to taste some of her delicacies, I still remained happily clueless.

Finally, the day arrived for the great escape. Decked in an elaborate kanjeevaram, sporting an enormous খোপা placed on my head by my mother-in-law, I ventured out into the unknown, with a nervous smile and a sinking heart. No, I didn’t worry about my husband showing up with his মেমসাহেব wife, or worse yet, not showing up at all. It was my mother’s exclamations that kept ringing in my ears. I got to my seat and immediately took the খোপা off and shoved it into my carry-on, a gesture that made me feel a tad lighter. The sari, unfortunately had to remain draped, although by the time journey ended it didn’t look a Kanjeevaram anymore, in fact it didn’t even look like a sari anymore.

No matter, there was my husband waiting for me wearing a huge smile. I tried to return it but not only was I still apprehensive, I felt decidedly ill after the long journey that had me sitting cramped in my seat for what seemed like an eternity. An elderly lady I had made friends with during the flight got ill and passed away before she reached her destination, which was London, now adding distress to my foreboding. I barely noticed the tiny orange car, “a 240Z” as my husband pointed out with pride. The beautiful landscape that we passed and the landmarks that were

pointed out were all a blur as I felt decidedly unwell by now. I did perk up when I saw the apartment, with its Scandinavian furniture and plush grey throw rug. “He is definitely deserving of brownie points for furniture and décor”, I thought to myself. Over the next few days, he picked up many more points as he drove me around picturesque Hudson valley, and I finally started noticing and admiring the lush beauty of the place. I even began to enjoy riding around in the tiny sports car…the one that my cousins had disappointingly remarked as it being an “এতো টুকুন গাড়ি!”. It was not an Impala, therefore not worth the mention.

Now this was turning out to be a lot more fun than Kalyani. We ate out a lot, although the food was not at all pleasing to my palate. However, the meals that he cooked with impressive ease at home were definitely more than edible and deserving of plenty of points. A small nagging doubt now crept into my mind. I began to wonder if my mother was right and “ছেলেটা” would not be content with “আলু সেদ্ধ, ডীম সেদ্ধ, ভাত”. So, when my husband returned to work after four days, I ventured into the kitchen with the impossible hope of impressing him. The fridge had a gallon of milk sitting in it. “Too much milk for two people” I decided. What did মা do when she had too much milk? She made মিষ্টি! I poured half the milk into a pot, turned the stove on and went back to the tv to watch “I love Lucy”, a program I had managed to get hooked on already. About a half hour later there was a fizzing sound from the kitchen and upon rushing in I found the milk had boiled over. There wasn’t much left in the pot, not enough for মিষ্টি anyway, so I turned the stove off and returned to Lucy. I did fret about losing the milk and was a bit dismayed that I was unable to impress my husband, but what to do? he will hopefully laugh it off, although I myself didn’t feel much like laughing. Then there was also this strange smell emitting from the kitchen and permeating the little apartment that soon got stronger than the smell of burnt milk.

নাঃ উঠতেই হয়! The smell was strong enough to distract me from Lucy. I picked up the phone and called a Bengali neighbor. My husband had left some instructions for me in case of an emergency. More points here, though I did feel a bit sheepish that the emergency occurred within a few hours of him leaving for work. She told me the location of the pilot lamp that was used to light the stove and asked if it was still burning. No, it wasn’t, and I was quite impressed at her deduction. “Go turn it on” she said, and I changed my mind about her intellect. “You must be joking! I am not going anywhere near that thing with a flame!” She emitted a loud sigh. She was now obviously questioning my intellect. She gave me the number of the maintenance office and asked me to call them.

Within a few minutes an elderly man was at the door, I suppose this was an

emergency after all. He raised the top of the stove frame and we were both startled. There was a pool of milk in there. “You need to clean this up”, he looked at me accusingly. “How do you do that” I asked?

His eyes widened but he decided to say nothing and picked up the sponge that I hadn’t noticed on the side of the sink. As he proceeded to mop and squeeze milk out into the sink, he started a conversation. Perhaps he did feel a bit sorry for this lost girl from India. He asked how my journey was and told me about how my husband had made the maintenance folks come by and paint the apartment before I arrived. More brownie points! Soon the stove was sparkling, the pilot lit and the apartment aired out. As he was about to leave, he stopped and pondered for a moment. Then he turned around and looked at me. “Young lady. Let me give you a piece of advice. If you wish to keep your husband happy you better learn how to cook”

Fast forward to five years, it was my daughter’s মুখেভাত and I had cooked the entire meal for a hundred and thirty or so guests with supporting help from my husband and none from my screaming seven-month-old. The need to learn how to cook had loomed larger yet, not just because of my mother’s desperate worries but also the concerned look on the face of a kind old man who I never met again.

Oh, for Love's Sake!

Hrisiraj Sengupta

Love. Who doesn't need love? Even the toughest of people can be tamed by a gentle touch of love. The scarcity of love in a person's life may make him desolate, lonely, and awfully pessimistic. Love drives joy in a person's mind and butterflies in his or her stomach. But here's the question. No, rather the catch. How far will you go for love? Whose love for you takes the lead in reciprocating your love for them? Let me tell you a story. A story of a young girl madly in love. A love story? You decide.

In the smoke-clad, pollution-laden streets of Calcutta lived a girl. Her name? Let's just call her 'She' for now. Now, she wasn't born with even a copper spoon, let alone a silver one. Her father, the lone bread-earner of the three-member family, worked as a laborer in a construction company. He managed to scrape in about two thousand rupees a month, maybe even four if lady luck opened her blindfold and looked in their favor. Her mother was a housewife with near to no education. The only thing she could read or rather recognize were the first few lines of a Sarasvati Vandana, that too with the aid of memory. Blessed with a child in the second decade of their marriage, the couple tried their best to ensure that her future, too, wouldn't be tossed into a pothole like theirs. While the mom wanted her to grow up into the 'perfect Indian housewife', and marry her off to a wealthy gentleman in the future, her father had different plans. Being a bright student himself, who was cast into the dark corners of society due to poverty, he wanted his daughter to do better. He cushioned her with all the knacks his meager income could afford.

She grew up into a virtuous and talented young lady, securing a percentage of just three less than the perfect score in her 12th standard boards, which landed her a seat, along with a scholarship, in the prestigious college of St. Stephen's in Delhi. Oh, you should've looked at her father's face! How it beamed with pride! Although he had to take out a loan the size of a national draft to sponsor her travels, he showed no sign of hesitation. For he could see his Lightbringer's future- a successful businesswoman or even the CEO of a tech giant- something she had always wanted to be.

And lo! There she landed in the bumming Indian capital. A determined girl with an acerbic wit, she instantly became a favorite among professors and pupils alike. She continued to ace her tests like she did in school and gave her father a lot to boast about back home.

First Semester: she topped her class with a staggering 95%, achieved the laurel of 'Best Speaker' in the College Fest, and sent her father an amount of 12,000 rupees- money she had earned working two odd jobs in a coffee shop and an apparel

showroom simultaneously. And sure, her father was jolly proud of her! This time even her mom's face lit up; she brought herself a sari from the posh 'Imperial Saree House' and her father took a day off to go down to the post office and mail her a photo of his wife in the saree, and a letter expressing his pride in his daughter and wishing her luck for future endeavors. It cost him a day's earnings to do so, but he couldn't care less. He perceived his action that day as one of pouring oil into his Lightbringer's lamp.
Second Semester; well, this is where things took a turn. For the good? We'll see that later. In the second semester, she met a boy named- let's call him 'He' for now- in the coffee shop she interned in. Oh, it was love at first sight! It seemed like both of them were made for each other. Wait, so the whole love thing distracted her from her studies? Of course not! Her percentage increased, and so did her roll of honor. This time she represented her college at a National Level debate contest, securing second place. But all these accomplishments were deserted as love became the highlight of her year.
The third semester, the fourth, and the fifth one, all followed the same pattern; her academics reaching an all-time high. She made sure to send money to her parents, albeit the communication between them saw a gradual decline. She didn't call up her father every night now, to give him an account of her day. She started taking that time out to stroll around shopping malls, pubs, and restaurants with her boyfriend, whom, according to a friend, she loved more than life itself. Her dad was, at first, a bit skeptical over this whole love thing. But soon, he too gave in seeing the joy it gave his daughter. Seeing his daughter happy was the only thing he ever wanted.

Then came her final semester. What would you expect? That love took the better of her and she flunked that sem, throwing her dad's dreams and aspirations for her down the drain? No, not at all! She was a smart girl, who knew how to balance love and academics perfectly. In fact, her grades that year were so perfect that they earned her a place in the prestigious Harvard Business School. Oh, you should have seen the look on her father's face! He wasn't just swelling but bursting with pride, every part of his body expelling an inexplicable emotion. It comprised tears, laughs, increased heartbeats, and screams, underlined with a hint of worry.
Wait, what worry? Were you so indulged in the tale of She's path to glory that you forgot about her dad's bread balance? Even though she had been awarded a scholarship, Harvard wouldn't pay for her plane tickets or accommodation. Besides, she received a 75% waiver on her tuition fees. 10 thousand dollars remained to be paid. Do you know how much that is in rupees? About 8 lakhs. 8 lakhs for a person earning less than 30 thousand a year! Was it even possible? The option of a loan seemed unlikely; her Stephen's loan payment was still pending. But he wasn't going to let her dreams drown in his sea of poverty. An idea struck his mind. He went to

the kitchen to have a conversation with his wife.
"Hey, listen. You know how we have to pay around 12 lakhs for bitiya's American studies?", said her father.
"What will happen by giving so much money? Let's get her married. I will find a good, rich boy for her", replied her mother with an utmost look of uninterest.
"Oh, shut up! You and your orthodox opinions I was thinking-"
"What thinking? From where will we get 12 lakhs? How do you plan on doing that?" said she now with a bewildered look.
With dense, underlying tones of what seemed nervousness in his voice, he timidly replied, "Uh, you know, uh people can survive with only one kidney, you know? One kidney can fetch, um, around 5-6 lakhs plus our daughter's savings..."
His sentence was interrupted by the sound of a dish breaking. Her wife stood there, unable to speak anything. Her mind wanted to question his sanity, but his body did not let her. He left the room, leaving her, accompanied only by an uncanny silence.
He made a call to a nearby hospital and inquired about the whole donation thing. Luck was on his side that day, as the authorities said they were in dire need of a kidney and asked him to come the next day. He faced the excruciating pain with a smile on his face- a smile bearing hope, great hope for his Lightbringer. The pain was almost driven away when he saw her sitting and attending classes in Harvard, rather a place he had built on the foundation of his imagination and labeled 'HARVARD.'
As promised, he was awarded a handsome amount of 6 lakhs. While the doctors thanked him and handed him the check, his mind raced back home to his daughter. Oh, he couldn't wait to see her face! As soon as the formalities were over, he raced back home, exploding with exhilaration and ebullience.
He excitedly called his wife as he reached for the door's handle. He expected her to come running, an expression of joy covering her face. She did come running, but what sprawled upon her face wasn't joy. There wasn't the slightest hint of happiness in it. On the contrary, it was terror! She was on the verge of collapsing when he held her up.
"What happened? What the hell happened?!", he asked shaking her.
"Bitiya! She's not opening her door! It has been four hours," she replied, her voice trembling.
"Wait, let me check."
He made his way to her room's door and knocked on it. Eventually, they changed into bangs.
"Bitiya open up! Open up, darling!"
Still, no answer.
"Quick, we have to break the door!"
He grabbed his hammer from the cupboard and broke the door open.
He let out a gasp. The scene that his eyes beheld was, well I cannot describe it. His

only daughter was lying on the bed, the white bedsheet stained red near her wrists. A 22-year-old girl had surrendered her life to God.
"Bitiya!" her mother burst into uncontrollable tears as she rushed towards her. "Quick, c-call, call an amb-ambul..."
The last word was engulfed into sobs and hiccups.
Slowly, he approached the bed and felt her hand. It was cold as ice. When the realization struck him, he broke down. Through the tear of his eye, he saw a piece of paper beside the pen-knife she had used to slit her wrists open. It read:
"Dear Baba and Ma,
He left me today. He said he didn't love me anymore. But I loved him, baba. I loved him more than life itself! I cannot imagine tomorrow without him. It would be meaningless. My life, I have already lost. There is no point in being alive anymore. I'm sorry Ma! I just can't.
Take care,
Your loving daughter,
S-"

The remaining letters of her name had been smeared by a teardrop. All of a sudden, her father's sobs muffled. A strange, archaic smile of desolation spread across his face. Oh, so she ended her life for the love of another boy. But didn't she stop to think for a moment that all the things she had penned for him also applied to her father? Didn't her father love her a lot? Wouldn't his life too, be meaningless without her? Hadn't he also lost his life? Was the last teardrop even for her parents or even that belonged to the boy? Amidst her mother's shrieks of anguish, her father slipped into oblivion.
A love story? You decide.

Devi Durga
Myra Mukherjee, 8

Weakie and the King of the Land

Mia Prabhu (6), Dev Prabhu (9)

(This story began as a game with my two little grandchildren, Mia 9 and Dev 6. One rainy day we sat around the breakfast table and decided to make up a story game. The rule was that we each would say a sentence and the next person in line would continue it. There were a lot of giggles, some corrections, a few disagreements but above all, loads of fun. All the illustrations were done by Mia Prabhu, and coloring by Dev. You should try it sometimes with little ones. It really was a lot of fun. – Subha Addy)

Once upon a time there was a tiger who looked big and strong but actually, he was weak. So, everyone called him Weakie. This made him sad. So, to make himself fit and strong, he went for long walks, but this did not help him much and he was often bullied by other animals in the forest. Weakie lived by himself in an abandoned castle in the forest.

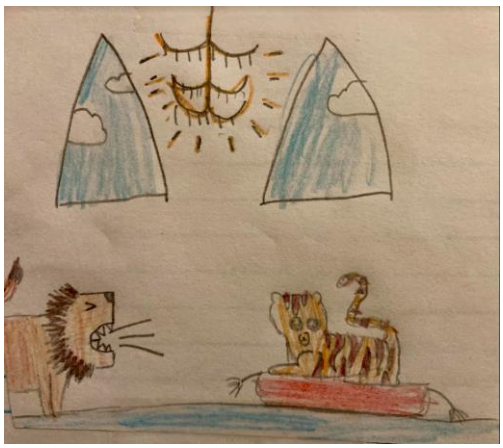

One day Weakie heard a loud bang coming from the castle gates. The King of the Land came storming through the door and roared, “you do not deserve this castle” he said. “You must get out of this castle now, or else!!” Okay” said Weakie. “Just give me one week to get all my stuff out, please.” Fine”, roared the King of the Land and stormed out of the castle.

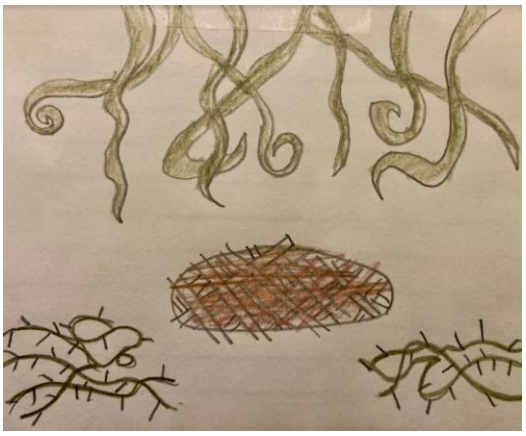

Once the King of the Land left, Weakie set out to find the best traps in the world. He would put them along the entrance hall so the King of the Land could not get to Weakie. The first trap was thorny rose bushes. The second trap was a deep hole with lava inside of it but it had twigs on top so no one could see inside the hole. The last trap was bushes that grabbed you and squeezed you so hard that you could not breathe.

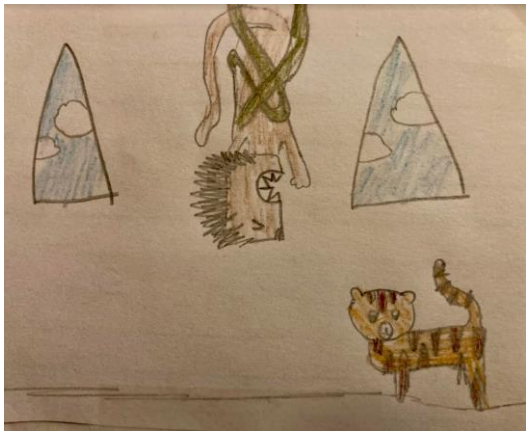

One week later the King of the Land came to Weakie's front door. He opened it and fell right into the thorny rose bushes. "Owwww!,Owwww!! Owwww!! he yelled in pain.

Once he got out of the rese bushes he fell right into the lava hole. He used his sharp nail to hang on to the walls of the hole, but his tail touched the lava and was burned badly. When he got out of the hole, he saw the vines and thought they were just vines and started to push them aside but got tangled up badly in them.

Weakie walked over to the King of the Land and said," I will release you if you promise to never return to my castle again. "Y—Yes" The King of the land said. Weakie released him and he never returned to bother Weakie again. All the other animals were happy for Weakie and became his friend.
Weakie lived happily ever after.

SHIVA JEWELERS
Austin's Premier South Asian Jewelry store
Lakeline Plaza
11066 Pecan Park Blvd Ste 520
Cedar Park, TX 78613
512-567-6372
www.shivajewelers.com
info@shivajewelers.com
Celebrating Traditions

Tagore Grove Memorial:

Inviting the world to revisit the legacy of a phenomenal Genius - Mrinal Chaudhuri, Houston, TX

A little over a century ago in 1921 Rabindranath Tagore, the world's first non-European and non-white Nobel laureate in literature from India, then under infamous British Colonial rule, came to Houston, America's fourth largest city. On the eve of his arrival in Houston, The Rice Thresher wrote, "Considered a genius, the great versatility of Tagore makes him an outstanding figure in the world today. He reached the height of excellence in every department of literature … showing creative genius and great originality. He is remarkable in that he combines in himself the traits of the East and the West in a super-degree. He is a contemplative philosopher, a mystic poet, and yet he is a man who can do things, an organizer who can make his dreams come true." The weekly student magazine of Rice University was spot-on about Tagore.

The Bengali polymath, though for all right reasons, has his pride of place in the world's intellectual heritage, has been often ignored undeservingly. And that too is at our own peril. Houston-based Tagore Society, a nonsectarian, nonreligious, non-political organization was established in 1974, with an avowed objective of spreading the universal human values Rabindranath Tagore, the winner of the Nobel Prize in 1913, firmly stood for. They have taken a humble yet very significant initiative to dispel the world's most developed nation's amnesia about the genius with a creatively sculpted memorial at Ray Miller Park in the center of the city's downtown.

The open-air memorial, inarguably one of its kind not only in the USA but possibly also in the whole world, was made open to the public on February 25, 2023. Thoughtfully designed around Tagore's full-figure bronze statue the space has sixteen panels in two customized octagonal arrangements with the inscriptions of some evocative quotes curated from his vast body of works as well as some comments about him from world famous writers like Romain Rolland and scientists like Albert Einstein. His novels, stories, songs, dance dramas, and essays centering topics political and personal are still oft-quoted and panned for their thought-provoking lyricism, colloquialism, naturalism, and prescient contemplation. His compositions were chosen by two nations as their national anthems: India's Jana Gana Mana and Bangladesh's Amar Shonar Bangla. (On this score too, he has no equal). Even a cursory glance at his oeuvre built around 50 volumes of poems

including Gitanjali – 'Song Offerings' that fetched him the Noble prize, 8 novels and 4 novellas, 93 short stories 50 plus plays, 2230 songs, 90 titles of essays, travelogues, letters, lectures will give an idea of the wide expanse of his creative landscape. The list of his global admirers was truly long and included (besides Rolland and Einstein) Ezra Pound, W.B. Yeats, Andre Gide, Saint-John Perse, Juan Ramon Jimenez, Boris Pasternak, Aane Akhmatova, Octavio Paz to name a few. His appeal between the two world wars became so ubiquitous that he had to trot the globe across 34 countries in that period and interact with almost all his contemporary luminaries. While Ezra Pound bracketed Tagore with Dante his proverbial poem "Where the mind is without fear" or the song, "If they answer not to thy call" continue to remain among the most oft-quoted resolutions by apostles of peace, political leaders, and celebrity activists alike across the world.

The Memorial has a story to tell, a short history of immersive engagement of many from diverse professions making it truly a collaborative tour de force by Indians and Americans together. It all began over a decade back with two prong mission. While one was to commemorate Tagore's visit to Houston that left a measurable impact, the other one was to focus on the greater goal of making it an organic interface for getting a curious glimpse into the works, thoughts and ideals of a multifaceted creative genius. Those are as relevant as they were during the tumultuous period between two world wars. It was about the same time when the project took off, British Journalist Ian Jack, equally troubled and vexed by the yawning ignorance about Tagore in the world beyond the mindscape of 250 million Bengals went eloquent in the Guardian. He wrote under a screaming headline "Rabindranath Tagore was a global phenomenon, so why is he neglected? … I consulted two dictionaries of quotations, the Oxford and Penguin, to check the most memorable lines of this poet, novelist, essayist, song and short story writer. Not a single entry.

They skipped from Tacitus to Hippolyte Taine as if there was nothing in Tagore's collected works (28 thick books, even with his 2,500 songs published separately) that ever had stuck in anyone's mind, or was so pithily expressed that it deserved to; as if what had come out of Tagore's pen was a kind of oriental ectoplasm, floating high above our materialist western heads, and ungraspable." TSH's reading of today's global reality was no different. Dedicated to the exploration of the legacy of cultural riches reaped by Tagore during his highly prolific productive life span of almost 70 years out of his physical longevity of 80 years, Tagore Society, to their collective dismay, didn't find the laureate's name in the list of twenty plus all-time greats in his field. Neither did they could make much headway to attain their objective of bringing back Tagore in the mainstream of diverse creative persuasions and critical thinking which comprised his unquestionable forte. He was, in fact, a

poet, painter, philosopher, social reformer, institution builder, innovative educator, songwriter, novelist, short storyteller, cultural historian, playwright, political commenter, humanist, environmentalist and public speaker-all coalesced into one; one with no parallel excepting Leonardo Da Vinci and Goethe. In addition, there is Ian Jack's other apt observation in the said article, "More than anything, what Tagore stood for was a synthesis of east and west".

In the first phase, the full-size statue sculpted by Gopinath Ray and Kamal Mondal, two Kolkata-based artists was installed. Post the installation a couple of flaws were detected. Lori Betz, an eminent American fine art sculptor and owner of Betz Art Foundry was asked for her remedial interventions which she undertook and immaculately retouched after her personal research on Tagore about whom she had been completely blank. Subsequently, the space around the statue came alive with the much awarded architect, Alvaro Espinal's time- consuming multi-phased experimentations in structural design that was fabricated with sixteen weatherproof alloy-made panels by Houston's premier billboard company Aria Sign & Design; and last but not the least among the attractions is the compatible and connotative Alpana (exclusively an Indian and South Asian folk art style featuring colored motifs, patterns and symbols) on the ground by Neha Bhavsar, a gifted American practitioner (of the art) of Indian origin. For Neha who only knew Tagore by name among them there was a reference to Alpana from a virtuoso master of this genre of art, Professor Sudhiranjan Mukherjee of Viswabharati University, Santiniketan (founded by Tagore himself using mostly his Nobel prize money and was dubbed by no other than Mahatma Gandhi as "a national treasure and international institution"). Mukherjee could only churn the theme-based alpana for a panel.

Taking the cue, she delved deep into Tagore's creative psyche to deliver a magnificent piece of artwork. In the whole episode, the story of Espinal, a Master in Architecture from the University of Texas is a living testament to the growing influence of the great man on someone with no inkling of him and who belonged to another century that is, even more, striferidden. After taking the first brief from TSH, he practically took a long sabbatical only to explore Tagore and then a couple of auto rejections later, when he came up with the memorial structure it became obvious that he was in perfect tune with 'Tagoreisque' sensibility. Many would argue that for professionals such a quest is nothing new or unique. But what stood out here is that the professional compulsion triggered in all of them a profound interest in Tagore. They all went beyond their respective academic referential practices, internalized the vision(s) he left for the world to become a place where every single mortal's dignity would be nonnegotiable and moved a few notches up both as artists and personalities. No exceptions were the employees of Arean Sign. They similarly left

no stone unturned to contribute to the concert of making the memorial one of its kind on American Soil, if not on the whole planet. To succinctly put, they together have proved that understanding Tagore is a rich transformational experience. Engagement with him is truly rewarding in our ongoing era. An era that spews venoms of rampant distrust and rattling discords has been leaving seemingly permanent scars on human civilization. Tagore rang the alarm bell with a note of nuanced introspective conviction that could make the difference if followed earnestly: “I slept and dreamt that life was joy, I awoke and found the life was service/ I acted and behold, service was joy”. Tagore Memorial will, for certain, witness footfalls of the visitors, mostly ones with no knowledge of him and chances are some of them will go back with an urge to know more about Tagore, his ideals and philosophy decoded through his writings and speeches which have been now far more consummately translated than before. In today’s global context, they will rediscover Tagore as a farsightedness phenomenon who has remained consistently relevant despite the abject amnesia about him.

Tagore had evidently harnessed his profound insights into human existence and its complex range of crises from India’s highly fascinating philosophical past and then deciphered them in the light of modern epistemology. He did it all through his life. His search for ‘truth’ went through Himalayan odds. But he stayed unshaken with unwavering integrity in his quest. He never shied away from the task of awakening man to the looming peril of the civilization that they themselves were responsible for.

MY HOLY TRINITY

Sayani Bose

I'm no writer.
But what I seem to have when I think of documenting my thoughts about my obsession for Food and how it has shaped my being and made me the Gastronome I am today, can probably be explained as Writer's Block. I strongly feel that Food is POWERFUL. It is capable of bridging divides and start conversations. From doing the bare minimal of satiating hunger, Food uplifts you, satisfies your soul and helps you unwind.

Growing up in the magnificent city of Kolkata, I have vivid childhood memories witnessing Baba procure the freshest and most authentic produce and Maa converting those into the most delectable, soul satisfying, unique culinary creations. My sister and I would wait turns to be the so-called sous chefs of Maa and sincerely hoped that she would let us in on her secrets for the recipes that would always magically turn out to be rich, nutritious, healthy and tasty at the same time. Maa's passion and precision in cooking always struck a chord with me and sooner than later I realized that cooking and feeding your family and friends can be the most rewarding and precious experiences one can ever have.
While growing up as a family of 4, we thoroughly enjoyed eating out in restaurants too. Both my parents had very clear choices of restaurants to frequent and very soon my sister and I started swearing by those institutions and developed a knack of finding new and interesting places to eat as a family. Eating out was a Tradition that our family still swears by and even today I take pride in being a Restaurant whisperer and making fantastic recommendations for friends to visit.
I would want to carry forward that tradition of delicious cooking at home and restaurant hopping outside with honest conviction in this foreign land and hope my kids also grow up to respect, love and appreciate foods of all kinds. So here goes my list of three Restaurants/Eateries of Kolkata that I call my HOLY TRINITY. I worship them, love them and swear by them!!

ZEESHAN (Park Circus, Kolkata)
In a parallel universe I'm married to the imaginary super cute son of Zeeshan's owner and have been inhaling the aroma of handi-fulls of Mutton Biryani, day and night from my living room right next to Zeeshan's main kitchen.
I was hardly 13 when I declared to my parents that I want to be married to someone from the family who owned Zeeshan in Park Circus. There were an astounding number of reasons to support my profound love for them. The most believable being

Zeeshan was among the only restaurants serving Mutton Biryani on Thursdays, proudly shattering stereotypes of not selling mutton on that day of the week that many other restaurants gave into.

It was the purest form of Love at first sight with Zeeshan. God situated it most pragmatically right across the street from my school and thus began an epic saga of the most organic tale of love for Biryani (and Mutton Tikia and Chap and Firni…) that would profoundly shape my adolescent years and make me the gastronome I am today. Almost every day I used to fervently pray that when Maa came to get us after school that she would by some miraculous reason declare that lunch that day would be Zeeshan's Mutton Biryani (it came in a shiny red box- red for mutton, yellow for chicken). Of course that prayer went unanswered most days. But when it did get answered , the butterflies in my stomach were hard to put to rest and I used to admire every grain of rice , the buttery aloo and the most succulent piece of meat completely awestruck!

A few days back on an apparent World Biryani Day I found myself missing my first love a little too much. For a lot many have come after it (Arsalan, Dada Boudi and the likes) and all of them brilliant in their own right but the unadulterated biased love I have for Zeeshan and it's Dalda laced Biryani is second to none, for I believe that it loved me much more than I could reciprocate.

MITHAI (Park Circus, Kolkata)
Syed Amir Ali Avenue is my favorite street in Kolkata and this street has seen me grow from a kindergartner to a young adult. It's my favorite because it's home to my Alma Mater, my very own Our Lady Queen of the Missions School where Virtue and Knowledge are not only the motto of the institution but also something which is carefully inculcated into every student who graduates from it.

But this is not the only reason why I love Syed Amir Ali Avenue so much. My admiration and love for this street is also entitled to the fact that it houses my favorite shop for Kolkata's Mishti - MITHAI. I love MITHAI so much that I actually named my daughter after them. For all the fascinating memories that MITHAI gifted me as a child where my sister and I inconspicuously followed Maa weekly after school to buy the world's best Mishti doi and slurpy long lyangchas, making my daughter their namesake was only fair, for that was the only way I could physically hold on to them forever. For all those of you who have been fortunate enough to savor Mithai's Mishti Doi, you know exactly what I'm talking about and why I call it the World's Best. The creamy melt in the mouth consistency of this Doi without being overly sweet is what makes it such a best seller. This hands down is the

ultimate after mint to a hearty Bengali Meal and you just cannot go wrong with it. What's surprising is that Mithai's Mishti doi is almost white in color and can easy camouflage as Tok doi. But that one spoonful of this heavenly dish will make your tastebuds irreconcilably happy and satiated.
As an ode to MITHAI, Syed Amir Ali Avenue and my dear School, I very often soothe my cravings by making a simpler version of the Mishti Doi especially during Bijoya Dashami with the hopes of making it a Shubho one.

KIM LING – Tangra (Chinatown, Kolkata)
There are certain smells that stick with you. Even after they are long gone. Even after you are far removed from the origin of that smell.

TANGRA (or the Chinatown of Kolkata) has a distinct smell, very peculiar but highly unique. The weird reminiscent odor of the bygone Tanneries coupled with the heady aroma of deep-fried Fish/Shrimp/Pork/Noodles and the concoction of Sesame Oil and Soy Sauce in the air, makes me Homesick and throttles me back to a time where a whiff of that air meant that the very best Chinese grub in town was Dinner for the day.

I was less than two years old when I first started trips to Tangra with Ma Baba. And the restaurant we always frequented was KIM LING. When I say Kim Ling is one of my Holy Trinities, I mean it, for I worship the place and worship the people there. Those of you are Tangra frequenters, the name Kim Ling surely resounds with you. And for the uninitiated, let me do you guys a favor.

KIM LING is an institution in Indo-Chinese Food. It's the OG Monica Liu's baby. And for context, Monica Liu is the Goddess of Chinese Food in Kolkata and is single handedly responsible for introducing and initiating the population of Kolkata with mind numbing Chinese Food that is Classic, addictive and is a Genre that cannot be competed against. I still remember Monica Liu dressed in comfortable shorts and top driving a scooter and coming in to check if everything was running smoothly in her kitchens. Speaking fluent Bengali, she would almost always strike up conversations with her loyal local patrons while doing the rounds of her restaurant. She would personally ask about the well-being of the kids and always enquire if the quality of the food was being maintained. That was paramount for her, always!! And that's why even till date Kim Ling never ever scrooges on quality. You will always be served the juiciest and the most luscious Golden Fried Prawns and the highest Quality of Cantonese Noodles there can be. Her diligence struck me even as a child and I would often declare to my parents that I would be a Restauranteur one day like Monica Liu.

Kim Ling is all renovated and fancy now (still has the best food imo) but it had very humble beginnings and that's what made it so special. It had limited seating, very basic table linen and cutlery and almost zero decorations. But what it had, to make up for all of that, was the Par Excellence food and the mind boggling, universe shifting fragrance of the food. For starters Baba always orders Chili Chicken (Dry) and always customizes it to include Extra Onions and Green chilies and the very subtle umami filled Spring Fish.

And since eternity, every time these two plates of food arrive at our table in Kim Ling, I feel unsurmountable joy. For I know that I am in the presence of something Godly, something extraordinary and something that should be celebrated. Immigrant Living has also made me teary eyed on the last few occasions that I visited Kimling because my anxious self knows fully well that the joy of relishing the Chili Lemon Fish and Mixed Rice Noodles from this Holy place is short-lived and dependent on visa restrictions.

Contrary to my great expectations and foolish, fanciful childish aspirations, I am nothing like Monica Liu and hence could not be a Restauranteur in Adult Life. But ever since I started finding Cooking interesting, I've hopelessly and tirelessly tried to replicate Kim Ling's Chilli Chicken at home. Master Chefs Kylie Kwong, Marion Grasby and the likes have left an indelible impact on my mind with their methods of High Flame Chinese/Thai Cooking and it's because of them that I learnt the nuances of using Oyster Sauce and Fish Sauce to enhance your home style Chinese Dishes to taste more like restaurants. The first time I used these two ingredients to make Chili Chicken at home, I cried a little. The Umami that was rendered by these two, took me back to my precious childhood evenings of happily waltzing away to Tangra with Bonu, Baba and Maa and having the absolute best Dinner always!!

My nth attempt at recreating Chili Chicken
(Tangra Style – similar but not the same, because it can NEVER be the same)

Main Ingredients:

Boneless Skinless Chicken Thighs cut into cube shaped pcs.
Red Onions (cubed)
Green Pepper (cubed)
Lots of Green Chilies (sliced)
Lots of Garlic (Finely chopped)

Oils:
Peanut Oil for deep frying the breaded chicken and cooking the dish.
Sesame Oil as a glorious garnish

For breading the chicken: (remember it's going to be very lightly breaded, just a little something for the chicken to latch onto)
All-purpose Flour
Cornstarch
Salt
Black Pepper
Egg

For the Sauce:
Dark Soy sauce
Light Soy Sauce
Fish Sauce
Oyster Sauce
Chili Sauce
Salt
Sugar

In a large bowl marinate the cubed chicken thighs with salt, black pepper, fish sauce, sugar, flour, cornstarch and an egg.
Let this marinade sit for an hour in the refrigerator.
Prepare the stir fry sauce in advance by mixing everything mentioned under the section For the Sauce.

Deep Fry the breaded Chicken cubes in hot peanut oil until golden brown and keep aside. Do this first before you start with the main dish.

In a hot Wok, add some Peanut Oil and chopped Green Chilies and chopped Garlic. Once your home smells like a Takeout Chinese kiosk, add the Cubed Onions and fry at a high heat until onions are translucent. Add the fried chicken thigh cubes to the whole mixture.

Toss around and mix well. Add the Holy Concoction (the Sauce) and (still in high heat) mix everything together until your wok looks straight out of a Food Network Show. In a small bowl make a slurry with two tablespoons of water and one tablespoon of Cornstarch. Pour the slurry to your dish.
The cornstarch slurry bundles and blends things together like a symphony and helps

attain the Dry-Semi Gravy texture that we are aiming for.
Add the green peppers at this stage. This is an optional step. A lot of folks do not like green pepper in their Chili Chicken (my Baba does not) while others swear by it. If you are adding them though, remember to add them at the end after most of the cooking is done, that way they stay crunchy and not limp. Mix everything well once again and turn the Heat off. Seal it with a generous drizzle of Sesame Oil.

Understanding a bit of Black History

Shantanu Ganguly

In September 2022, we retired and decided to kick off this new phase in our life with a road trip. We planned a trip that would start in Galveston, then New Orleans, go through Alabama, Georgia, both Carolinas, Virginia, Washington DC, and ending up in New York City. The focus of the trip was going to be primarily Black History. During this trip we saw many exhibits and museums that were off the path of usual tourists. We experienced stories that were never told and understood the atrocity of not just slavery but it's aftermath. I took photographs and blogged extensively during our trip. In this article I will focus on Alabama. We spent four nights in Alabama in Montgomery. We spent one day each seeing Montgomery, Birmingham, and Selma. The day we left – we drove to Georgia, stopping in Tuskegee to see both the airbase of the famous Tuskegee Airmen and Tuskegee University where an infamous medical experiment was performed on Black people. Below are the three blogs I posted on our three days in Montgomery, Birmingham and Selma.

Montgomery

We are staying in Montgomery AL for four nights. Montgomery calls itself MGM but it's a serious place. It's the state capital, the spot where the group of states that wanted to preserve slavery decided to break off from the Union and form the Confederacy, and finally it's a key stop on the Civil Rights Trail. This is where Rosa Parks decided to not give up her seat to a white person. This is where Reverend Martin Luther King decided to dive full time into the Civil Rights movement. This is where the march from Selma came to. This is one of the places the Freedom Riders were trying to ride to protest segregated buses.

MGM is also the home to the stunning Legacy Museum: From Enslavement to Mass Incarceration. There's just one other place where I have come away deeply disturbed yet convinced that everyone needs to see it. That place is Dachau.
Unfortunately, the Legacy Museum does not allow photography, so you have to go to their website to see a few pictures. The exhibits start with the slave trade, walk the visitor painstakingly thru transatlantic slavery (which was banned in 1808), the thriving domestic slave trade (continued until the end of the Civil War - because enough children were being born into slavery), the feeble attempts at reconstruction, the reign of terror when the Union soldiers departed the south, and systematic racism that continues to this day. It's a deeply moving exhibit that took so much time to see that after two hours we took wristbands, left for lunch and came back to see the rest of the exhibits. This is not a museum you want to hurry through

and check off your list.

After seeing the Legacy Museum, we walked about 20 minutes to The National Memorial for Peace and Justice, where the lynching of African Americans is laid out in excruciating detail as a series of names per county. Then we walked back to the Legacy Museum where our car was parked, with a stop at the Rosa Parks Museum, and small detours to see the statue of Rosa Parks, a spot where slave auctions were held, the house from where the declaration of war against the Union was declared (General Beauregard fired the first shots at Fort Sumpter which we saw later in North Carolina), and a few other historical markers.

Getting back into our car, we saw the church where Rev King used to be the pastor. The church should have been closed but we managed to get in with a visiting college group and were able to see the inside. Then we saw the first Confederate White house (small, white, unimpressive) - the headquarters of the Confederacy was shortly moved to Richmond which is on our route. Finally, we walked around the AL Capitol reading a series of historical markers that completely glossed over the dark history of the state. Our walk culminated with seeing a statue of Jefferson Davis, with all the slave states called out at the base of the statue. The statue was donated by the United Daughters of the Confederacy, an organization established to whitewash the history of the South.

Walking back, we thought we had seen it all but that was not the case. We came across the Lurleen B Wallace state building. Lurleen was the first wife of the notorious segregationist Alabama governor George Wallace and succeeded him to due to term limits to continue his ideology. Very similar to what happened with Pa Fergueson & Ma Fergueson in TX or Lallu Prasad Yadav & Rabri Devi in Bihar.

A monument to lynch

Lynching in Travis County

Statue at National Memorial for Peace and Justice

Reverend King's Church

Civil Rights Mural in Montgomery

Birmingham

Birmingham is a relatively new city compared to Montgomery and Selma. The latter two pre-date the Civil War by decades and are built on the banks of the Alabama river which runs roughly east-west in this area. Birmingham is north, built at the crossroads of two railroads after the Civil War. There were a few company townships here - factories with squalid living quarters for the workers. Due to the demand for labor, the usual prison labor tactics were put in place to supply people. Blacks were jailed, often on flimsy charges, and put to work. The same method was used in Sugarland TX for the sugarcane plantations, where a recent mass grave with some horrifying data has come to light.

Birmingham was called Bombingham during the peak of the Civil Rights movement- due to the constant bombing of black churches. We started our visit with the 16th street Baptist Church where 4 young girls lost their life. In the subsequent demonstrations, two young black boys were shot to death. One was shot by a white teenager who received a six-month sentence. The prosecution was dropped by J Edgar Hoover. The case was eventually reopened multiple times and some of the perpetrators were sent to prison. Please read the Wikipedia page, it's riveting. After seeing the church, we visited the Civil Rights institute which is adjacent to the 16th street church. A lot of events of various civil rights activities are covered here, in a haphazard fashion.

After lunch we drove to the Bethel Baptist Church and learned of Reverend Fred

Shuttlesworth. An unsung hero of the Civil Rights movement, his home was bombed and destroyed. Somehow, he miraculously escaped unscathed and continued activism, despite many assaults and beatings. It's an incredible story of heroism. There's a short walk around the church with historic markers.

We returned to the Civil Rights museum and took another walk going thru a set of markers describing the various civil rights struggles in Birmingham. Then we took a walk along the Black Business District where we entered a store and had a long chat with the elderly couple who own the store. The lady showed us many old photographs from the Civil Rights Protests era, including the famous photograph of the marchers gathered at the Edmund Pettus Bridge in Selma. She pointed to a lady with a handbag in the front row and said, 'That was my aunt'.

A pall still hangs over Birmingham and the entire state of Alabama. Blessed with excellent natural resources, the state seems to have squandered its good fortune with discrimination and stymied growth by causing new businesses to stay away. The old industries of Birmingham are now rusting hulks.

Protesters gathering to march from the Edmund Pettus bridge in Selma to Montgomery

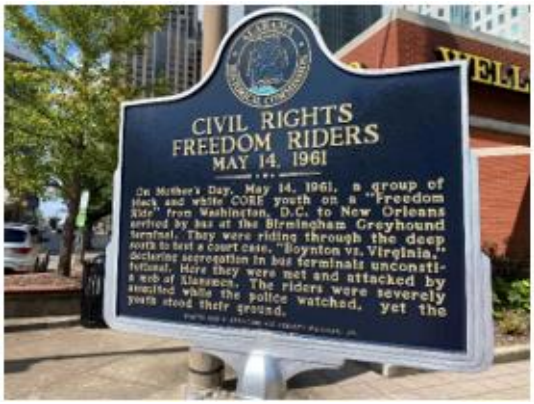

A memorial to Civil Rights at the Greyhound bus terminal

Rev Shuttleworth's church and the outline Of his house that was destroyed by a bomb

The 16th Street Church in Birmingham, it was bombed by white supremacists, killing four little girls

Selma

On our third and last day in Alabama - we drove from Montgomery to Selma, a short drive of under an hour. We parked at the Montgomery side of the Edward Pettus bridge, where there is a monument to the Bloody Sunday beating that happened as Civil Rights protesters tried to March from Selma to Montgomery. Disgustingly, the bridge is named after a former Confederate brigadier general, U.S. senator, and state-level leader ("Grand Dragon") of the Alabama Ku Klux Klan. The Alabama legislature has decided in April 2022 to rename the bridge as 'Edmund W. Pettus - Foot Soldiers Bridge'. We walked on a short trail under the bridge where we saw some graffiti directed at the our former President. Then we drove to Selma, parking right next to the Selma Interpretive Center - an exhibit run by the National Park Service.

We walked up and down Broad Street (the Main Street that starts from the bridge and runs through Selma), looking at storefronts. Selma is quite run down, and other than fast food there's almost no place for a decent meal in the town. We shared a sandwich in a coffee shop and walked back to the center. Several storefronts seem to have gone through a halfhearted renewal effort that was abandoned - perhaps because of the pandemic. We walked in and saw the small but well laid out visitor center. An exhibit of batons that were used to beat the marchers was particularly disturbing to see, especially because right next to the display was a picture of Bull Conner with one of such sticks in his hand. Commissioner of Public Safety of Birmingham and a staunch segregationist, Bull Connor instituted the policy of using fire hoses and police attack dogs against protesters.

After the center, we took a short walk along the river, looking from the outside at a couple of museums that seemed very poorly created. They were all closed so we walked back and drove to the local cemetery. Here we saw the tomb of Nathan Bedford Forrest – infamous confederate general and the first Grand Wizard of the Klan (the latter is not called out but hinted at on the marker). There were also a series of well-tended graves with Confederate flags on them. This entire section is cared for by the United Daughters of the Confederacy- a group that has spent decades and a lot of money in revising history, whitewashing the Confederacy, and romanticizing the South.

I knew that the display would be upsetting but I did want to see it and document it as the alternate reality that a faction of this country is living in, and in that perspective, it did achieve the goal. Feeling quite upset, we drove over to Sturdivant Hall. The hall is an antebellum mansion that surprisingly does not have an association with slavery, plantations etc. The tours were closed, so we looked at the

hall from outside and drove back to Montgomery.

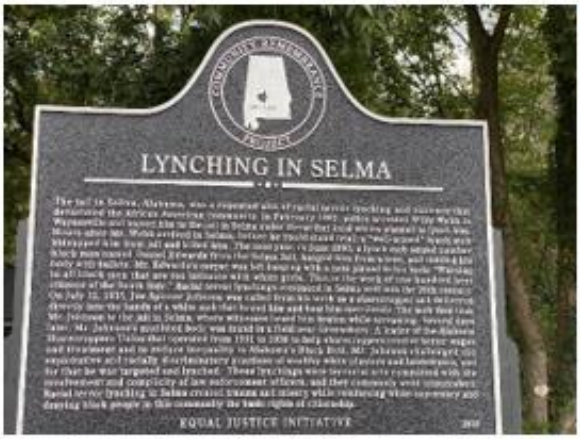

A memorial to lynching

Edmund Pettus Bridge

One of the march organizers

Denial of voting rights: Blacks had to correctly guess the number of gumballs to be allowed to vote

Nathanial Bedford Forest's immaculate grave with Confederate propaganda

Memorial to John Lewis who became a famous political leader, he passed away in July 2020

Pondering from a Perilous Perch

Sumit DasGupta

Fifty plus years past, I set foot on this land where my roots have sunk deep and wide. As I prepared for further studies abroad while nearing the completion of my undergraduate degree in electrical engineering at Jadavpur University in Kolkata, I became quite enamored with Germany, influenced by a favorite professor who spared no opportunity to assure me of admission to the University of Berlin from where he had earned his PhD and then taught there till a few years earlier. Under his tutelage, I even studied German and became quite conversationally fluent in it, residues of which still linger among my grey cells. A close second choice was Canada, again influenced by a friend's brother who had earned an advanced degree there as well as the enticement of an easy immigrant visa that the Canadian government was openly waving. A poor, significantly lagging choice, truth be told, was the US. But then two incidents occurred that forever altered the trajectory of my life. First was a chance encounter with four students from Harvard University, three white and one black, at the United States Information Service library that was hosting their tour throughout India. I was impressed beyond measure by their easy demeanor and positive, open outlook. They painted a picture of campus life that I hadn't ever dreamed of till then. Second was a fortuitous proposal from my Bengali teacher from my high school in Darjeeling, St. Joseph's, North Point (nicknamed NP), to inform me of an exchange program that NP was setting up with Marquette University for bright NP alumni, strongly recommending me to apply,… and so I did, more to placate him but with no expectations beyond, for Germany kept beckoning. A few months later, I was in, just that simple! And thus it transpired that the Labor Day weekend in 1967 found me not in Berlin, not in Montreal nor Toronto but smack in downtown Milwaukee, Wisconsin.

Two years and an MS degree later, I found myself at IBM's plant in E. Fishkill, NY as a fresh employee hired to join the team charged with the design of the first generation of fault-tolerant, electronic memory sub-systems. As a side note from day one, I realized I was a misfit. Amidst the sea of blue-suited, narrow-lapeled, stripe-tied, wing-tip-shoed, short-haired technologists, here I was with my shoulder-length hair, loud ties, suits with broad lapels and no wing-tip shoes. It is a tribute to the values present that I was still welcomed as an equal member of the team. I went through the usual indoctrination "extravaganza", I learned about IBM's values, its principles, its practices and its standards for performance evaluation. But what stood out most was a little booklet entitled "Respect for the Individual" that the founder of IBM, Tom Watson, Sr., had originally penned in his own handwriting that became

the Bible that all managers and employees lived by. The other highlight among the droll HR presentations related to IBM's support for graduate studies,… more on that later. Using the principles so defined in the "little booklet", IBM hired men and women, white and black people, without bias and paid equal pay for equal work going back to the 1920's. And this was the model that many other enterprises emulated as word spread about its positive impact on employees and the community at large. Tom Watson, Jr., the founder's son who followed, was the CEO credited with steering IBM away from tabulating machines and deep into computers. As part of this effort, he initiated a "life-long learning" philosophy along with a fellowship program to sponsor employees with high levels of achievement to pursue their PhD's at full salary and with all educational expenses covered and with no discontinuity in service benefits for the years away, yours truly years later being one of its beneficiaries.

As word spread about the "little booklet", the Federal Government came calling sometime in the early 1960's, at a time when the country was belatedly awakening to the unpalatable truth that while the Confederate States had lost the war a century earlier and slaves been freed, state's rights and Jim Crow laws in many of these same states had denied the former slaves and their descendants in the south most of the rights that the whites deemed as their birth right as inscribed in the US Constitution. A quick review of that booklet convinced the Federal reviewers that the rules we practiced within the walls of IBM were too strict and demanding for any Southern Democrat to stomach. So, little by little, the rules were diluted till a version was agreed upon between our esteemed lawmakers so that one fine day a new law was passed in our capital that became enshrined as Affirmative Action (AA) and Equal Opportunity (EO). Instantaneously, it bent the arc of our national character towards justice and equality. While many loved it, many others despised it, latter swearing to eliminate it even if it took decades.

As managers at IBM, we were trained incessantly on the tenets in the "little booklet" and lived by them but we also embraced the deliberate process of AA/EO with AA defined to level the playing field across all races and genders. It is what defined our strategy towards minority colleges and universities, and support for minority groups (PoC, women, etc.) which included training and eventual hiring for full-time employment. Over the years, these principles and methods seeped into our blood and being. We believed in them and practiced them. For me, it became very personal, I practiced the same tenets long after the sunset of my career at IBM. And now this precious law has been eliminated as far as college admissions are concerned and many suspect that AA as a standard in corporate behavior will soon be axed. The detractors who swore to remove it have finally succeeded. Time will tell

that this is a day that the nation will rue,… to its own detriment!
On a very personal note, the elimination of this supposedly sacrosanct law with fifty years of legal precedent has a particularly sensitive ring-tone. As an undergraduate at Jadavpur University in India, I rubbed shoulders with students who arrived through “scheduled castes” quotas, a name, a branding of sorts I did not look at too fondly, but whose goals were noble. The government had created this quota system through which every college had to admit a certain number of talented students from the lower castes that had been historically marginalized by the occupants of the higher castes. One could consider this program as India’s version of AA/EO,… on steroids! And this quota system continued into the employment process for government jobs. One such student in my class was Asit Charchari, yes, Charchari, later legally rechristened as Choudhury, from Midnapore who did not need to be in any quota, for such was his brilliance, such were his achievements as the “topper” in our class. Jadavpur University awarded him a very generous scholarship that left him spare money to send to his widowed mother every month.

As a fervent opponent of the caste system, this quota policy made eminent sense to me but almost mechanically, too distant, too staccato! It took me almost five years to completely appreciate, through an anecdotal happenstance, the burden that centuries of denial and discrimination can impose on the disenfranchised. Six months prior to graduation, we began interviewing for post-graduation employment. As one of the top-10% students with complete command of English and confidence in connecting with foreign interlocutors, thanks to my education at St. Xavier’s and NP, I was the beneficiary of the majority of the interviews from the likes of GE, GEC, Philips, etc., besides many name-brand Indian enterprises. On the other hand, how many of these interviews did Asit get? None, zero, nil! I was perplexed by this apparent unfairness and questions to the Employment Officer on campus only elicited vague responses. But the reason became apparent, quite perchance, when I dropped in on a friend in the college hostel. Quite by accident, I encountered Asit in a hallway. There he was, casting a solitary shadow, practicing to walk in his first ever pair of dress shoes, limping painfully from the blisters. He owned no formal attire, no blazer nor a tie and his English, to be generous, was marginal at best,… in other words, after five years of exemplary grades, he was obviously unprepared for the tough interview process with brand-name companies where English was the language of choice. This is what centuries of deprivation had wrought on him and his ilk that even a quota system would take many decades to eliminate its consequences. So, his fate, despite being the topper, led to a lower-paying job at a government enterprise, Chittaranjan Locomotive Works. This experience made such a deep impression in me that when I encountered the “little booklet” at IBM, as well as the derived AA/EO program, I embraced it

wholeheartedly and practiced it through my entire career as a life principle. Simply said, they made me a better human being!

Now, fifty plus years after my arrival, I feel despondent for our future generations. In my early years here, despite the penumbra of the Vietnam War and the tumult of the civil rights movement, despite the trauma of the double assassinations of Martin Luther King and Robert Kennedy, there was enough humanity and fellowship to endure the pain and soldier on. Heady times did follow. The US continued as the undisputed leader of the Western world, man shed the bonds of Earth to venture out to our moon "in peace for all mankind", the economy continued to thrive at a merry pace, jobs were plentiful and opportunities were opening, albeit sluggishly, for black and brown people. And of course, the music, oh, the music, there was such an abundance of great stars who mesmerized us with their music. And in the intervening years, through economic upheavals and wars, through good times and bad, we were indeed a blessed land where an African American could eventually be elected to the highest office in the land. But from 2016 onwards, dark clouds have gathered all around us underscoring the fact that elections have consequences. Mass shootings are an everyday affair. Racial and communal hatred are ascendent.

Threats towards LGBTQ+ people are reaching epidemic proportions in some states. Above all, elected politicians threaten the democratic foundations of this nation while the Supreme Court, emboldened by new conservative appointments, has decided to ignore precedents and overturn laws that have underpinned our values for decades. Elimination of Roe v. Wade was devastating. And now AA is relegated to history! Words cannot express the sadness I feel at their demise. We are on a very perilous perch indeed! The only means to descend from this unsteady roost, in my mind, is to commit to vote with our conscience in 2024 and beyond as if our lives depend on it, for it literally does, voting for those who commit to defend democracy, ensure racial and social harmony, promote human rights, combat climate change, and guarantee healthcare for all,… period! Never has there been a better time than now to quote the immortal words of Bob Dylan as a concluding statement to remind all of the times we are in:

"Come gather 'round, people
Wherever you roam
And admit that the waters
Around you have grown
And accept it that soon
You'll be drenched to the bone
If your time to you is worth savin'
Then you better start swimmin' or you'll sink like a stone
For the times they are a-changin'"

Unleash the Beauty of Traditional Elegance
with our Indian Boutique Collection

Z'bella

Indian Ethnic Haute Couture

(512) 991-2992

sales@zbellacouture.com

Scan to follow on Instagram

Scan to follow on Facebook

www.zbellacouture.com

Travelogue of an Epic trip to Greece!

Pradipto Mukherjee

In early May 2023, we embarked on a 23-day trip to Greece mainland and its three key islands – Mykonos, Santorini and Crete!! This was truly a trip of a lifetime – as we had the opportunity to see and experience history that goes 4700+ years back – starting from the early Minoan civilization in Crete from 2700BC!! When most of the world was in darkness – there were brilliant Athenians like Pericles that gave the world the first recipe of democracy; amazing artists, sculptors and architects that still wow's us with their creations; the Olympic games that started in Olympia which still unites the world with the camaraderie and friendly competitions among nations to give our best; … !!
Our tour started with the American tour company Collette (our first conducted tour in Europe and we can highly recommend them!) - flying into Athens from Boston. Athens, is the Capital of Greece, a country that has a beautiful mainland and nearly 3000 islands spread all over the Aegean Sea to the East and the Ionian Sea to the west. The population of Greece is about 11 million - out of which nearly 5 million lives in and around Athens only!!

Any travelogue on Athens has to start from the "core" - namely the Acropolis. Acropolis is one of the seven hills of Athens and is considered its cathedral - a much revered religious place with temples dedicated to different goddesses that the Athenians used to worship. Pericles the famous Greek general turned politician was responsible for building the Parthenon on top of the Acropolis in the 5th century BC. That period is known as the period of Pericles who also was responsible for the start of Democracy in Athena. Parthenon structural architecture has no straight lines that are truly horizontal or vertical - to create an optical illusion. Its "Ionic" architecture was measured in - geometry, symmetry and harmony. The Romans, the Persians and the Turks could not build another Parthenon – because of its unique architecture. Acropolis gives the visitors some of the most amazing views of the whole of Athens stretching all the way to the Peloponnese.

One can truly appreciate the vibe of Athens with the experience of ambling through the narrow trendy lanes of the two most vibrant neighborhoods of Athens - Plaka and Psyri - that both hugs below the hills of Acropolis. It's a joy walking thru these lanes surrounded by quaint multi colored small buildings with vibrant bougainvillea's draping the walls for our eyes to feast on!! The lanes are dotted with boutique stores selling fashionable clothing's, trendy shoes, jewelry, to artistic painting and glassworks!! There are cute coffee shops tucked in every corner (the Greeks are

addicted to good coffee - they only drink tea when they are sick) and mom and pop restaurants selling Greek delicacies. In Psyri, you see all different immigrant communities living in harmony and expressing and sharing their love for food, clothing and art with all Greeks and her visitors to enjoy!! The lanes are dotted with interesting graphics and images and the air is filled with the smell of different cuisines getting prepared by talented chefs!

On the third day, we left Athens and traveled north through central Greece to Thermopylae. We stopped to see a monument dedicated to the famous Spartan King Leonidas who died defending the city against the Persians. We continued towards the small beautiful town of Kakambaka to see Meteora's famous monasteries.

Meteora was, in the words of Saint Anthanasius - a place "between heaven and earth "!! Meteora, which is a UNESCO world heritage site, is a collection of 200 odd dark grey sandstone pinnacles that rose about 2000 ft above the village of Kalambaka. Today there are only 6 out of 24 monasteries remaining that seems to "hang in the air"! We visited the Monastery of Varlaam - a community of 10 monks belonging to the Greek Orthodox Church. The second one was Rousanou Monastery which is actually a nunnery - run by a community of 30 nuns. Both the monasteries depicted the austere life of the monks and nuns - and their dedication to their life's spiritual journey to seek God and salvation.

From Meteora we travelled nortwest in between the Gulf of Corynth & the North Euboean Gulf to visit the ancient city of Delphi (the center of the world – according to Greek God Zeus!) - one of Greece's most important religious centers. A local expert guide took us on a visit to the Sanctuary of Apollo, the Doric Temple, the ancient amphitheater, the stadium above and the Delphi Museum with its priceless collection of ancient artifacts. It was here that the famous Oracle was consulted to foretell the destiny of Man. The Temple of Apollo in Delphi dates back to the 4th century BC. Above the temple is the very well-preserved theater, where 5,000 spectators could sit. The work on the amphitheater started in the 3rd century BC and later it was restored by the Romans. It's said that the birthplace of Greek music was in Delphi with the holding of music and poetry festivals in the amphitheater. From Delphi we continued on to charming Arachova, a popular ski resort town with breathtaking views of the surrounding mountains and valleys. The view from our hotel room balcony can compare to the "Sound of Music" background of Salzburg - it's humbling and spellbinding!!

From Arachova, we drove besides the Bay of Corinth (beautiful drive) for nearly a couple of hours to the Rio-Antirio bridge (world's second biggest multi span layered

bridge) that took us to the University town of Patras. The next 2 days started with a tour to an Olive farm that's rated one of the best in the country. It's like visiting a wonderful Napa winery - excepting they sell olives, olive oils and many other eclectic things (including fine jewelry for tourists !). That afternoon, we had a wonderful Greek dance class at our hotel - and it's was a lot of fun with some Ouzo (local anise flavored drink) - followed by a sumptuous dinner. The view of the Peloponnese valley from our hotel room with its gorgeous sunset was a sight to behold!!

The next morning, we went to Olympia where the first Olympics were held in 776 BC. Rupa ran the whole straight track! Our local guide Nikita (she was truly amazing!) told us the whole history of this place - that had us riveted the whole time. Olympic Games were started in Greece to kind of unify the city states, that were primarily fighting with each other. The purpose was to show all the Athenians, Spartans, Phoebians, etc. that there were more in common among them which can unify them as one nation. Olympic Games were first a religious festival (people will bring gifts to Lord Zeus) and then an athletic festival later. Initially only men were allowed to participate - and in nude with no women spectators. The training of the athletes was rigorous - but it was not just physical training - they were also taught classes in art, philosophy and science. Greeks believed in the development of a balance human being - strong physically but also kind & gentle inside. That's why Greek statues of men were idealized structures - very masculine neck below but more feminine face - the objective was to demonstrate a strong and a kind man - a perfect balance!! The afternoon (after our Olympia visit) was spent well going to a Greek cooking class where we learnt how to make Greek dishes Tsatziki and Sagnaki - followed by a sumptuous lunch!

We drove east from Olympia thru the Peloponnese to the most beautiful town in the area of Argolis called Nafplion. Nafplion is one of the most romantic cities all over Greece and was the first capital of the newly born Greek state between 1823 and 1834 before being moved to Athens. According to mythology, the town was founded by Nafplios, the son of God Poseidon and the daughter of Danaus Anymone. Ancient walls, medieval castles, monuments and statues, Ottoman fountains and Venetian or neoclassical buildings shows the stamps of all the different intruders that ruled this region. It was an absolute joy walking over the cobblestone streets of Nafplion - with its amazing architecture, brightly colored bougainvillea draping the walls of these beautiful houses!! We stayed at the Nafplion Palace hotels that's on top of the hill and part of the Akronafplia castle complex. The views from our room of the Aegean Sea and Bourtzi the Venetian fortress on the ocean were spectacular!! We also went to see the archaeological ruins of the Mycenae, the legendary kingdom of the Atreides, that stretched from the Argolic Gulf to the north of Athens. We went past

the oldest town in Europe called Arogos.

Next day, we drove from Nafplion for a couple of hours very early morning to drive to the port of Piraeus in Athens to catch the fast ferry to the beautiful island of Mykonos!! Mykonos is an eclectic island with its pristine beaches, elegant boutiques, fine dining - all packed onto one tiny piece of land, a mere 15km long at its widest point. The famous areas of Mykonos where we spent most of our time were:

- Agia Anna Beach - its golden sand, aquamarine waters, many idyllic churches, boutique shops and great restaurants - time flies here!!
- Matoyánni Street - We strolled through labyrinth of many narrow lanes and by-lanes decked with boutique stores, souvenir shops and bougainvillea covered cute homes
- Venice of Mykonos - most scenic area of the island with homes standing by the blue waters of the Agean sea with row of windmills on top of the adjacent hills on the other side!!
- Panagia Paraportiani Greek Orthodox Church - this church is called “Our Lady of the Side Gate” and is made up of whitewashed walls with five chapels

Our hotel in Mykonos was San Marco - a nice resort up on the hills from where we got a birdshot view of the island and the sea. Our room had a nice balcony and a private roof from where we could see the big cruise ships sailing into the islands harbor.

Our next stop - Santorini - probably one of the most photographed islands in the world!! Rising out of the crystalline waters of the Aegean Sea, Santorini's volcanic landscape of black, white and red-sand beaches and the enormous caldera meet quintessentially Greek white-washed houses. The main island is further split into beautiful villages perched on top of the mountains from where you get the most breathtaking views of the Aegean Sea, whitewashed houses by the hillside and beautiful blue domed churches and mosques.

We decided to do a full day cruise (highly recommended) in Santorini. The catamaran we rented sailed the southern coastline of Santorini - showing us the Red, White & Black beach and the Akrotiri lighthouse. We went past the three small islands of the caldera - namely Nea Kameni (the volcanic island), the smaller Palia Kameni (with its hot spring) and the Aspronissi (that our tour operator fondly called “the cupcake” !). We sailed north along the western side of Santorini - viewing the towns of Fira (capital of Santorini), Firostefani (where our Santorini Palace hotel was) and Oia that hugs the steep cliffs of the island mountains. We then came to the inhabited island of Thirassia where we had an amazing late lunch prepared by the

crew!! The day ended from where we started - and many on the trip had a deep tan line by then!!

Next day morning we went to the excavation site of Akrotiri - a must see in Santorini. Akrotiri to Greece is what Pompeii is to the Italians. Akrotiri was a Cycladic Bronze Age settlement in Santorini that later developed into a big urban center & port. The town's life came to an abrupt end in the last quarter of the 17th century B.C. because of severe earthquakes. The volcanic eruption followed and the lava covered the entire island and the town itself. The volcanic lava, however, have protected up to date the buildings and their contents, just like in Pompei!!

We were very fortunate indeed to have the most amazing weather (55-77F temp, only half day of drizzle) for our entire Greece trip - which gave us the opportunity to see some spectacular sunrise and sunsets both in the mainland as well as in the islands!! However, I have to say that sunset on the Aegean Sea from Santorini Island will be etched into my memory forever!!
We flew back from Santorini to Athens and that brought an end to our 16 days conducted tour.

We flew from Athens to Heraklion (capital of Crete) with Aegean airlines (excellent service!). This started our second phase of travel in Greece - all by ourselves! Yes, I did rent a car to satisfy my desire to drive and crisscross this beautiful island. Crete, the largest of Greek islands, is a place where myth meets history. Crete was the center of Europe's first advanced civilizations - the Minoans from 2700 to 1420 BC. We wanted to spend most of our time enjoying Crete's natural beauty - which it has a plenty!! We stayed in Heraklion, the island's capital and largest city. Our hotel was right in the city center (with wonderful views of the Aegean Sea, mountains all around) - we walked to most of the historical landmarks namely Kouless Fortress, the Venetian harbor, the City hall, etc. Most of the natural beauty of Crete is towards the west near the Old town of Chania - called "The Venice of the East". Chania is characterized by a blend of Venetian, Ottoman and Neoclassical monuments and architecture. Its streets are narrow, colorful and picturesque. We walked by flowered balconies, traditional shops selling Cretan boots, lively restaurants and cozy cafes. The most beautiful part of Chania is the promenade along the Venetian port, from where you can see the Venetian lighthouse.

The rest of our trips were visiting the most beautiful pristine beaches on the western part of the island along the northern and southern coastline!! They are:

- Balos Lagoon beach is probably one of the two most beautiful beaches in Crete!! The drive to this beach was hair raising - as the last 10km is a completely

unpaved road - deep 1000ft drop to the ocean on one side and mountain goats on the edges of the cliff all around!! A quiet beach, opposite the two Gramvousa islands (Wild and Tame), it features warm, turquoise waters, white sand and a beautiful blue lagoon in the middle

- Falassarna Beach is a series of large sandy stretches that run together for 3 km. The main beach of Pacheia Ammos (Deep Sands), one of the most popular in Crete, is made up of white sand and turquoise waters. Falassarna is an ideal destination for wind surfing lovers.
- Elafonissi beach is probably the most emblematic of the island, and frankly speaking what brought me into Crete. Elafonissi beach is characterized by shallow crystal-clear turquoise waters, pink color beach made up of crushed pink sea-shells!! It has a wonderful lagoon where the different hues of blue come out in true splendor!!
- Triopetra beach is sandy, pretty much unspoilt, featuring crystal-clear water and breathtaking sunsets. Its name means "Three Rocks" and refers to the impressive rocks that characterize its landscape. The vast dunes that enclose the Agios Pavlos beach are its chief attraction and they can attain up to 30 feet in height.

After spending 4 days in Crete, we flew back to Athens – as no trip to Greece is complete without seeing the “Acropolis Museum” and “National Archaeological Museum”. The Acropolis Museum by Acropolis citadel and has more than 4000 Greek artifacts – mostly found/excavated from/around Athena itself. The exhibits primarily focus on the 5th century BC statues and architecture. The exhibits from the National Archaeological Museum are excavated from all around Greece which includes gold funerary, frescoes and figurines, alabaster tools and ivory carvings!! We spent a whole day and a half walking/Uber-ing all around Athens (best way to see any city) to see the following:
Panathenaic Olympic Stadium; Changing of the guards at the Tomb of the Unknown soldier; Strolling thru Varvakeios Central Market; Monastiraki Square; Visting the Orthodox Church of; Panagia Kapnikarea; Temple of Zeus; Hadrian’s Library; Roman Agora and the Ancient Agora & Temple of Hephaestus

All good things must come to an end!! It was hard to bid adieu to Greece – a travel that is etched into our memory for good!! The pain of leaving Greece was lightened when we thought of all the happy faces that will be waiting for us eagerly at Logan airport in Boston!! We left a part of our soul by the Aegean Sea while the remaning was eagerly waiting to be hugged by the small hands of an angel in Boston – such is life, I guess!

Terra Cotta Warriors of Xian, China

Sunit K. Addy

Few years ago, we had an extensive tour of China. As you see in this schematic map reproduced form the guidebook, three fourth of the China's population live in the one third of the area occupying the eastern half of the country (green area) we pretty much covered the whole country except the Tibetan region. The places we visited were Beijing and the Great wall, Terra Cotta statues of Xian, Karst topography of Guilin and Yangtze River Cruises, the amazing lighted city of Shanghai and many others. Today, I picked the Terracotta warriors of Xian to show how did a bizarre thinking of a young king might have shaped the Chinese art and craftsmanship and provided us with valuable insights into the military and cultural history of the Qin Dynasty (221–210 BC).

Fig 1. The various places we visited in China. The map is reproduced here from our guidebook.

Fig 2. Statue of Emperor Qin Shi Huang, the First and Last Emperor of the Qin Dynasty. He proclaimed himself as the first emperor of the unified China in 221 BC and reigned to 210 BC.

The tomb complex was accidentally discovered in 1974 but the extent of the archeological treasure strove that was discovered was beyond anyone's imagination. Qin Shi Huang was the first emperor of China and played a pivotal role in unifying China under a centralized imperial government. He designed his own tomb complex with more than 8000 life-size Terra Cotta soldiers, archers, cavalry and chariots. He created this army to protect him in the afterlife and believed that his large terra cotta army would also symbolize his power and authority and would save him from any future army in his afterlife. The tomb complex is so vast that it would take many decades to explore and study this discovery.

Fig. 3 This is the site where the first discovery of the Terra Cotta soldiers were made by the local farmers digging a well near the city of Xian and recovered some pottery fragments. Since then, careful exploration and restoration is being carried out in Pit 1, 2 and 3.

Fig. 4. This is an extraordinary underground treasure: An entire army of life-size terracotta soldiers poised to defend the Emperor in trenches 3 to 4 meters separated by 2 m of consolidated clay walls. In these three pits there are a total of about 8000 soldiers, archers, cavalry and chariots. At present there are about 2000 items in various states of restoration and preservation. Rest are still underground waiting further excavation and restoration.

Fig. 4. Each soldier is uniquely crafted by a master sculptor possibly looking at a real-life model and in this case a soldier, a corporal, an archer or a General in the Emperor's army. Look at the different faces and expressions on the figures and their different physique. Each figure has different facial expression and a different hairstyle. Not two individuals are the same.

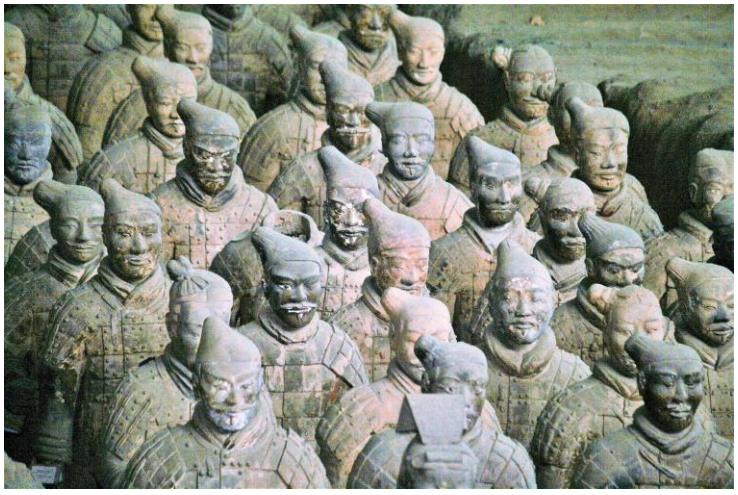

Fig. 5. I cannot stress the fact more that each individual terracotta soldier is a different person and there was no mass production. Look at their facial expressions. A commonly asked question why all of them are facing in one direction. They are facing the side from which the invaders were perceived to invade Xian and the Emperor thought that they would also come from the same direction in his after life as well. That is not the direction of the Mausoleum of the emperor in which the emperor was buried. During his reign, building his tomb with all its statues was a big industry by itself and benefited the Chinese economy.

Fig. 6. Traces of pigmentation are left on the body, and they were of vibrant colors. The preservation of the color is a big problem now. The layers of various colors get oxidized and disintegrate by natural decay. Also, after the death of the Emperor these terra cotta figures were severely damaged by fires set by other conquerors from regions and local vandals. The signs of destructions are all over. However, the archeologists are handling this problem with many painstakingly difficult restoration methods.

Fig. 7. Notice that the soldiers put on their appropriate uniforms according to their ranks. Their uniforms were made in absolute details. Imagine how amazing they might have looked with fresh paints. The demeanor our was unique for each statue. I found that almost all had a smile in these two pictures.

Fig.8. Subha was delighted to be there with me. This is Pit no. 1. It extends over an area larger than 3 football fields and it was difficult for her to walk and navigate with the swarms of young visitors. But she was a good sport. This project is enormous, and I believe it is all paid for by the constant streams of tourists. This will probably remain like this for the rest of this century as this exhibition will grow more with excavations of other nearby pits and the mausoleum. Yes, it is a large treasure strove that Emperor Qin, unknowingly left for the future generations of a country that he first unified and ruled for two decades only.

Fig.9. This pit shows many soldiers and horses fully preserved except the vibrant colors they originally had. Restoration is a difficult process. Look at the swarms of visitors near the edges of this Pit watching all the excavation steps from gathering small broken terracotta pieces to restoring them all together and preserving them with proper chemicals. This project is enormous, and this will remain like this perhaps for the rest of this century.

Fig. 10. Another pit (No. 2) which was under excavation and restoration. Recent digs have revealed that in addition to the clay soldiers, Emperor Qin, presumably had a terracotta court that surrounded him during his lifetime. This included musicians, acrobats, ministers, dancers and other important dignitaries. Of course, all these need to be confirmed by further excavations by archeologists (Reported by Smithsonian).

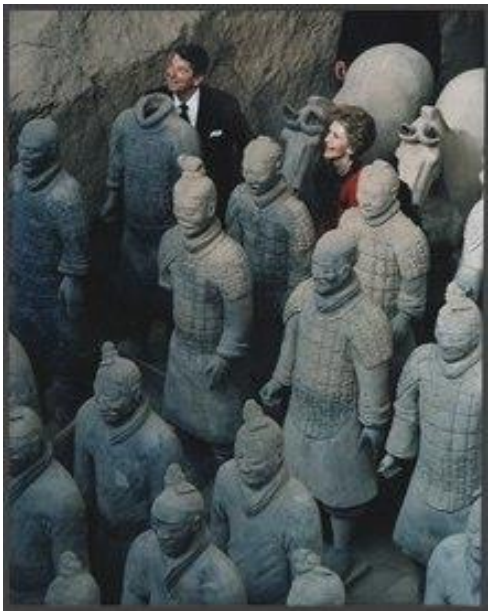

***Fig. 11a (Left)**. Emperor Qin was born in 259 BC, and he ascended the throne at the age of 13 years in the year 246 BC. Perhaps soon after that he started the construction of this magnificent project. The building process lasted like 38 years involving 700000 artisans. He died in 210 BC. The Emperor was a very powerful man with excellent administrative qualities, but he was not a popular emperor. The tomb was raided by General Xiang Yu, a contender for the throne, less than five years after the death of the First Emperor. Parts of the tomb was SET ON FIRE in several attacks. In the process, many of the terracotta soldiers were smashed into pieces. The existence of this vandalism is present in many places as we see many black fire marks on the walls and on the bodies of the terracotta soldiers. These facts are well documented by a historian Sima Qian (145-90 BC). Subsequent, C14 dating confirmed these facts. Luckily, the vandalism was not that extensive in some cases. **Fig.11b (Right)**. President Ronald Reagan and First Lady Nancy Reagan visiting the Terracotta army in 1984. This picture is in the public domain and is reproduced here.*

Fig. 12. It is believed that the Emperor started planning for his burial long before his death in 210 B.C. This group appears to be all army but in Pit 3, there are figures of other officials which appear as poets and accountants etc. This way the Emperor had his whole court with him in his after-life. Another thing you will notice that some of these Terra Cotta warriors have severe black stains on them. Many of the trenches with the soldiers were vandalized and were SET ON FIRE not very long after Emperor Qin was buried.

Fig. 13. The three pits (1-3) that are now explored to fully or in part may have an estimated more than 8,000 soldiers, 130 chariots with 520 horses and 150 cavalry horses, the majority of which remained buried in the pits nearby Qin's mausoleum. This part has been designated for future excavation. Many of the trenches have smashed figures and perhaps they were vandalized before they were set on fire. Here we see a couple of horses fully restored.

Fig. 14. Proper preservation of these burned trenches is still going on. As you see the wooden beams were set on fire and the charcoal from these ruins confirmed the age of the fire. The enormity of this project is mind-boggling involving many professionals from many disciplines. When the actual mausoleum of the Emperor is opened perhaps it would be a wonderland for the archeologists and the anthropologists. There are stories, that I have heard and read that there were of rivers of mercury, sky studded with jewels inside the mausoleum etc.

Fig. 15. Here we can see two chariots driven by 4 horses each, and they are left possibly for the visitors to see how they were found. These are extremely good examples of their state of preservation. For 2 thousand years they remained like this, and that is Amazing. I will show you a fully restored chariot with horses and his driver.

Fig.16. A fully Restored Charioteer and his Chariot along with the horses are shown in the museum. Other statues are possibly of that of the Emperor Qin himself (?) or a very high ranking official in the extreme upper left, a General, in the right corner and two of his foot soldiers below.

Fig. 16. There was one theory that possibly there were some mass production of bodies (torsos) done because there were not a whole lot of individual characteristics on them and that the heads were made separately with models in front. But some experts discounted that theory. Because not all fingers are same, and individuals have different types of fingers. They believed that in the meticulous way these life-sized statues were made, there was no mass production, and each figure was created by a master builder with the subject in front. Please note the subtle differences in the fingers of these terracotta figures.

Fig. 17. Now after fighting the maddening crowd in the Terracotta pits, we visited a fancy restaurant and saw some more replicas. We had some time to look at the most beautiful and important statues leisurely at our own pace in the lobby. Not two statues are same and there are probably six thousand or more life sized were statues made. Looks like each soldier has been sculptured by a master sculptor with a model in front. The excavation and preservation are going on and will go on for next 100 years or so as the guide mentioned. There are several other untouched large mounds, and no one knows what wonders they might contain.

Fig.19. A sword retrieved from on of the pits showed some amazing facts. Metallurgical analysis reveals that the surface of the sword contains Chromium with a thickness of 10 to 15 micron which acted as a protective coating against corrosion according to the Museum data. They also claim that Chrome plating technology was invented by Germans in 1937 and in the USA in 1950. It looks like the technology emerged in China some 2200 years ago. Amazing Achievements!!! However, some experts believed that this could be caused by simple contamination.

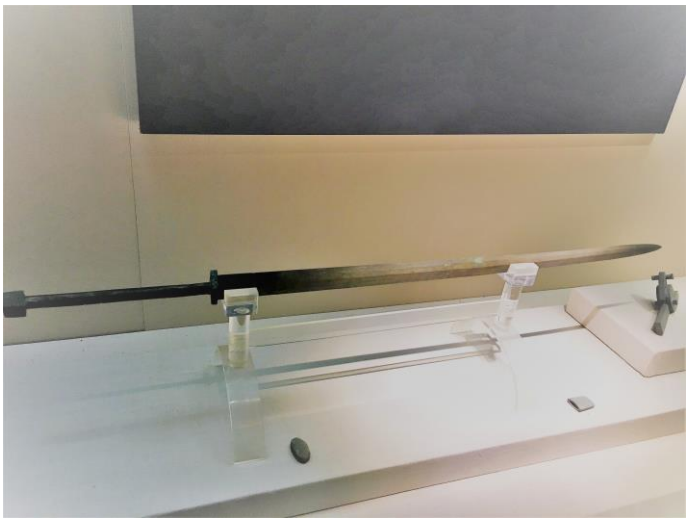

Leaving the Xian Terra Cotta soldiers and hoping to return in future to see additional excavations and perhaps more amazing facts. Several mounds have been identified as possible targets. Perhaps the main Mausoleum of Emperor would be open by then but that is a pie in the sky. Dear friends, hope you enjoyed the walking tour of the Terra Cotta Warriors of Xian.

Congratulation !
Recent Graduates

Aayushee Dasmunshi
Graduating from: CPHS
Going to : UTSA
Major : Computer Science

Adarsh Ambekar
Graduating from: West Wood High School
Going to : John's Hopkins University
Major : Neuroscience

Ankhi Banerjee
Graduated From: Round Rock High School
Going to: Rice University
Major : Computer Science

Rajonna Sen (Mohor)
Graduating from : Westwood HS
Going to : Texas A&M
Major: Biomedical Engineering

Ishan Dasgupta
Graduating from : Westwood HS
Going to : UT Austin
Major: Computer Science

Looking out - Ratula Sarkar

THE DESI CREATIONS

panache

HANDLOOM AND DESIGNER SAREES AND PURE SILVER JEWELRY

WISHES ALL CTBA MEMBERS

HAPPY DURGA PUJA 2023

@Panache.the.DESI.creations

@Panachecreation

panachecreation.com

US Boutique

15700 San Solano Ct, Bee Cave, Tx 78738

312 . 698 . 8857

India Boutique

28 Jahura Bazar Lane, Unit no.4, Kolkata 700042

RETHINK YOUR BANK

Switch to RBFCU

Really Free Checking
- $0 monthly maintenance fee
- $0 minimum balance

RBFCU Mastercard® Credit Cards
- Choose from cash back rewards or low rates
- Personal and business cards

Certificate Accounts
- Earn higher yields
- Secure and low-risk

Mortgage Loans
- Purchase, refinance, home equity, land, construction

Auto Loans
- New, used or refinance – same competitive rate

Join for free with promo code AU0257.
Expires 12/31/24

Join today at rbfcu.org

EQUAL HOUSING LENDER

Federally insured by NCUA

Membership eligibility required. Loans subject to credit approval. Rates, terms and programs subject to change without notice. Certain restrictions may apply. Minimum initial deposit and minimum balance for Certificates is $1,000. Penalty for early withdrawal may reduce earnings. Mortgage loans available only on property in Texas. RBFCU NMLS# 583215. RN2292211

8